ইসলামের সমাজ দর্শন

সদরুদ্দীন ইসলাহী

www.pathagar.com

ইসলামের সমাজ দর্শন

মূল
সদরুদ্দীন ইসলাহী
অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৫০

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৬
শ্রাবণ	১৪১২
আগস্ট	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMER SAMAJ DORSHON by Sodrudden Islahi. Transalate by Abdul Mannan Talib. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 50.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রসঙ্গ কথা

'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব' বইটি প্রকাশের পর ইসলামের সমাজ দর্শন বইটি বাংলা ভাষায় মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী সাহেবের দ্বিতীয় বই। ইসলামের সমাজ দর্শন সম্পর্কে বাংলায় ইতিপূর্বে কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। এদিক দিয়ে এ বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের একটি সম্পূর্ণ নতুন দিকের দ্বারোদ্‌ঘাটন করবে।

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী বর্তমান মুসলিম বিশ্বের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন চিন্তাশীল আলেমদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেমন সুষ্ঠু ও পরিপক্ক তেমনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব', 'ইসলামের সমাজ দর্শন', 'ইসলামের ভিত্তিসমূহের পুনর্গঠন', 'ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব', 'শিরকের তাৎপর্য' ও 'নেফাকের তাৎপর্য' বইগুলো বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

'ইসলামের সমাজ দর্শন' বইটি নিষ্ক্রিয়তা ও পলায়নী মনোবৃত্তিকে নতুন করে কর্মচঞ্চল ও কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করবে এবং অন্য দিকে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা জীবন ক্ষেত্রে সতত সংঘর্ষরত আছেন তাদেরকে শক্তি যোগাবে এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে দৃঢ় ও মজবুত করবে বলে আশা করি।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বকথা

কর্মের অবনতি দীর্ঘকাল স্থিতিশীল হলে তা আর নিছক কর্মের অবনতির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং প্রথমে আবেগ ও অনুভূতি এবং পরে চিন্তার অবনতির রূপ পরিগ্রহ করে। কোনো জাতি জীবনক্ষেত্রে যখন নিজের আসল মর্যাদা হারিয়ে বসে তখন তার মনোজগতও অধিককাল ঐ মর্যাদার যথার্থরূপ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় না, আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে সে নিজেই তলিয়ে যায়। এ পৃথিবীতে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং সে উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য তাকে কোন্ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, একথা সে বিস্মৃত হতে থাকে।

মুসলিম জাতির ওপর বেশ কিছুকাল থেকে এ মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া চলছে। আল্লাহ প্রদত্ত দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখা, সমগ্র দুনিয়ার জন্য সত্যের সাক্ষ্যদানকারী ও সংরক্ষক হওয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা এবং পরিপূর্ণ কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। এটিই ছিল তার অস্তিত্বের পরম উদ্দেশ্য এবং এরই মধ্যে নিহিত ছিল তার সত্যিকার মর্যাদা। কিছুকাল যথাযথভাবে সে এ দায়িত্ব পালন করলো। কেবল সে নয় বরং অন্য সবাইও এ জাতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও এর আসল মর্যাদা প্রত্যক্ষ করলো। অতপর তার গাফলতি তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে নাস্তানাবুদ করে দিল এবং তাকে নিজের আসল মর্যাদা থেকে কার্যত বঞ্চিত করলো। এ বঞ্চনা স্বাভাবিকভাবে আরো অনেক বঞ্চনার জন্ম দিল। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, জীবনাদর্শ ও দীনী চিন্তার ফাঁপা শব্দগুলোই শুধু তার স্মরণে রয়ে গেছে, কিন্তু সেই শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থও যে যথাথভাবে অবশ্যি তার স্মৃতিপটে লিখিত রয়েছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আর কোনোক্রমে একথা বিশ্বাস করে নিলেও কমপক্ষে আবেগ ও চিন্তার দিক দিয়েও যে তার মধ্যে ঐ অর্থগুলোর গুরুত্বের অনুভূতি রয়ে গেছে, একথা কোনো অবস্থাতেই স্বীকার করা যেতে পারে না।

এসব জীবন দর্শন ও দীনী চিন্তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার সামষ্টিক চরিত্র ও বিশেষ সংগঠন। এটি বাহ্যত একটি বিষয় হলেও

www.pathagar.com

আসলে বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টি। একে মুসলিম মিল্লাতের নাভি মনে করলে ভুল হবে না। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও কার্যকরী দাবী থেকে সাধারণ মন-মস্তিষ্ক দুঃখজনকভাবে সম্পর্কচ্যুত হয়ে গেছে। এ সম্পর্কচ্যুতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আজ জাতির নেতৃবৃন্দের একটি দল তা চিন্তা করতেই ভয় পায়। তারা দীনের সামগ্রিক ভূমিকা ও জাতির সংগঠনকে যামানার সবচেয়ে বড় কুফরী মনে করে। তাদের মতে মানুষ প্রত্যেকটি কাজের জন্য একত্রিত হতে পারে, প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য কোনো সংগঠনের ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে, প্রত্যেকটি মিশন ও ইজমের জন্য দল গঠন করা যেতে পারে ; কিন্তু মুসলমান মুসলমান হিসেবে ও ইসলামের জন্য কোনোক্রমেই সংগঠিত হতে পারে না। অন্য লোকেরা যদিও এভাবে চিন্তা করে না এবং তারা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে নিজেদের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা মনে করে। কিন্তু মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হবে কেন, কিভাবে ও কিসের ভিত্তিতে ; আর যদি না হয়, তাহলে তাতে আসলে কি ক্ষতি হবে ? তাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই একথা জানে ও বলে থাকে। কাজেই এ প্রসঙ্গে যা কিছু শোনা যায়, তা অনেক সময় "কালেমাতু হাক্কিন ওয়া উরিদু বিহাল বাতিল"-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] মুসলিম জাতির সংগঠনের নাম নেয়া হয়, অথচ এর অর্থ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি সবকিছুই সাধারণত ইসলামের চেয়ে বেশি অনৈসলামের ধারক। মুসলমান যেভাবে যে কোনো কেন্দ্রেই একত্রিত হোক না কেন তা তাদের মতে ইসলামী ঐক্য ও জাতীয় সংগঠন। অথচ ইসলাম মুসলমানদেরকে কেবল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে সংগঠিত হবার নির্দেশ দিয়েছে। মুসলমানদের প্রত্যেকটি সামাজিক কাঠামো তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ। অথচ নিছক জামায়াত নয় বরং "আল-জামায়াত" তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। আর "আল-জামায়াতের" অর্থ আল্লামা রশীদ রেজা মিসরীর ভাষায়- "নবুওয়াতের যামানায় মুসলমানদের এমন সামাজিক কাঠামোকে আল-জামায়াত বলা হতো, যা কুরআন ও সুন্নাতের বিধানাবলী কার্যকর করে দীনকে কায়েম রাখতে সক্ষম হতো।"-তাফসীরে আল মানার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

১. এটি একটি আরবী প্রবাদ। এর অর্থ হলো কথাটি সত্য, কিন্তু এথেকে ভুল অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে। হযরত আলী (রা)-এর আমলে খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা হযরত আলীর নেতৃত্ব মেনে নিতে চাচ্ছিল না। তারা ছিল সরাসরি আল্লাহর নেতৃত্বের প্রয়াসী। তাদের শ্লোগান ছিল, "ইনিল্ হুক্মু ইল্লা লিল্লাহ"—আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হুকুমদাতা নেই। তাদের একথা শুনে হযরত আলী বলেছিলেন, 'কালেমাতু হাক্কিন ওয়া উরিদু বিহাল বাতিল।'- অনুবাদক

www.pathagar.com

এ পরিস্থিতিতে এ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রয়োজনীয় দিকসমূহ কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে সুস্পষ্টভাবে পেশ করার প্রয়োজন ছিল। তাহলে জাতীয় ঐক্য ও সংগঠনের কথা আলোচিত হবার ও এ ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা চালাবার সময় বিষয়টির আসল রূপ প্রচ্ছন্ন থাকবে না এবং একথা ভালভাবে জানা যাবে যে, ইসলাম যে সমাজ ও সংগঠনের নির্দেশ দিয়েছে তার স্বরূপ কি ? দীন ও মিল্লাত তা কতদূর কামনা করে এবং কেন ?

এ বইটি আসলে এ দাবী পূরণের একটি প্রচেষ্টা। আল্লাহ যেন এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

সদরুদ্দীন
সোমবার, ২রা যিলহজ্জ,
১৩৮১ হিঃ।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবন ১৩
মানব-প্রকৃতি ও সমাজ জীবন ১৩
ইসলাম ও স্বভাবধর্ম ১৬
স্বভাবধর্মের সুস্পষ্ট দাবী ১৯

ইসলামে সমাজবদ্ধ জীবনের স্বীকৃত গুরুত্ব ২৫
এক ঃ সামাজিক ধারণা ২৫
দুই ঃ সাংগঠনিক বিধান ২৭
তিন ঃ সাধারণ সামাজিক বিধান ৩১
চার ঃ ইবাদাতের সামগ্রিক অনুষ্ঠানাদি ৩৪

গুরুত্বের কারণ ৪৫
অসামাজিক জীবনের ভয়াবহ পরিণাম ৪৫
এক ঃ পরিবেশের বাতিলপ্রিয়তা ৪৬
দুই ঃ দীন অনুসৃতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য অপূর্ণতা ৪৮
তিন ঃ দীনী অনুভূতির ধারাবাহিক অবনতি ৫১
সমাজ জীবনের অমূল্য অবদান ৫৪
সংসারত্যাগী মহাত্মাদের সমস্যা ৫৫

ইসলামী সমাজ দর্শন ৫৭
সামাজিকতার উদ্দেশ্য ৫৭
সমাজগ্রন্থী ৬০
সমাবেশের পদ্ধতি ৬৩

ইসলামী সমাজের রূপরেখা ৬৬
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্যতা ৬৬
ইসলাম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ৬৮
শরীআত নির্দেশিত খেলাফত ব্যবস্থা ৬৯
খেলাফতের দায়িত্ব ৭৬
খেলাফতের অধিকার ৭৮
আনুগত্যের পরিসীমা ৮৪
খলিফার পদচ্যুতি ৮৭

www.pathagar.com

পদচ্যুতির ব্যাপারে তমদ্দুনিক ক্রমবিকাশের প্রভাব ৯৫
খেলাফত ব্যবস্থার ঐক্য ১০১

জাতীয় নৈরাজ্যে দীনী দায়িত্ব ১০৫
সামাজিক শৃংখলা বিধানের প্রয়োজন ১০৫
সমাজব্যবস্থা সংস্থাপনের পদ্ধতি ১১৪
নয়া সংগঠনের বাস্তব রূপ ১২০

নির্জনবাস ১২৫
শরীআতের দৃষ্টিতে নির্জনবাস ১২৫
কর্তব্য নয় ; সুযোগ ১২৬
অবস্থা ও শর্তাবলী ১৩২
কাজের ধরন ১৩৪
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা ১৩৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবন

মানব-প্রকৃতি ও সমাজ জীবন

মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেমন শিশুর ধারণা করা যায় না অনুরূপভাবে সমাজক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন মানবজীবনের ধারণা করাও অসম্ভব। মানবেতিহাসে এমন একটি যুগও পাওয়া যাবে না যখন মানুষ সমাজের সামান্য মুখাপেক্ষীও ছিল না। কাজেই ইতিহাসের অস্পষ্ট এলাকায়ও তার চিহ্ন অদৃশ্য নয়। যখন "তমদ্দুনের" ভিত্তি-প্রস্তরই স্থাপিত হয়নি, যখন মানুষ গুহার বাইরেও আসতে পারেনি, যখন সে শস্য উৎপাদন ও বস্ত্র বুননের কথা চিন্তাও করেনি, যখন বৃক্ষপত্র ও ফলমূল এবং বৃক্ষের ছায়া তার জীবনীশক্তি যোগাতো তখনো সে পরিবারবদ্ধভাবে মিলেমিশে বসবাস করতো এবং এ সমাজবদ্ধতাকে সে নিজের জীবনক্ষেত্র মনে করতো। অতপর তার সাংস্কৃতিক রুচি যত বেশি পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে এবং ব্যাপকতর সমাজবদ্ধতার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর হতে থাকে, ততই তার সমাজপ্রীতি উজ্জল ও সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। পারিবারিক একক গোত্রীয় এককে, অতপর গোত্রীয় এককসমূহ জাতীয় সমাজে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বর্তমানে এ জাতীয় সমাজসমূহ একটি সামগ্রিক পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে বরং একটি আন্তর্জাতিক পরিবারে রূপান্তরিত হবার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

মানুষের এ ধারাবাহিক কর্মধারার কারণ কি ? প্রথম দিন থেকেই সে সমাজের সন্ধানে ফিরেছে কেন ? যুগের গতিধারার সাথে সাথে তার এ সন্ধানী মনোবৃত্তি শক্তিশালী ও স্পষ্টতর হয়েছে কেন ? এ প্রশ্নগুলোর জবাবে একবাক্যে একথাই বলা হবে যে, অবশ্যি এমন কিছু প্রবল শক্তিধর কার্যকারণ আছে, যা তাকে নিজের জাতির অন্যান্য লোকদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবার অনুমতি দেয় না, যা ভিতরে ভিতরেই তাকে স্বজাতীয়দের সাথে মিলেমিশে থাকতে এবং পৃথকভাবে ও নির্জনে বসবাস করার পরিবর্তে সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। নিজের মনের গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা এর দুটি কার্যকারণ দেখতে পাই, এক, স্ব-জাতির প্রতি আকর্ষণ ; দুই, সহযোগিতার প্রয়োজন।

www.pathagar.com

'স্ব-জাতির প্রতি আকর্ষণের' অর্থ হলো এই যে, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্ব-জাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগের অধিকারী। তার জন্যে সে নিজের মধ্যে গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। তার সংগ-সুখে সে আত্মিক ও মানসিক শান্তি লাভ করে, স্ব-জাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্কচ্যুতি তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি করে এবং নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালীন নির্জনতা তাকে আতংকিত করে।

'সহযোগিতার প্রয়োজনের' অর্থ হলো এই যে, এক দিকে তার একক ও ব্যক্তিগত শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ আর অন্য দিকে তার তুলনায় তার পার্থিব প্রয়োজন বিরাট, বিপুল ও অত্যন্ত ব্যাপক। তাই ঐ প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে এ শক্তি কখনো যথেষ্ট হতে পারে না এবং কেবল নিজের ব্যক্তিগত শক্তির জোরে সে কোনোক্রমে এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না। এমন কি যেসব প্রয়োজনকে মৌলিক ও অপরিহার্য বলা হয়, সেগুলো পূরণ করাও তার জন্য ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ আরো অনেক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে সাহায্য না করে।

এভাবে বিচার করলে দেখা যায় সমাজবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা এবং প্রয়োজনও। স্ব-জাতির প্রতি জন্মগত আকর্ষণের কারণে সে অযাচিতভাবে অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিজের পার্থিব প্রয়োজনের কারণে তার মুখাপেক্ষীও থাকে। এর অর্থ হলো, সমাজ প্রিয়তার দুটি শক্তিশালী শিকড় একই সাথে তার প্রকৃতির গভীরে নেমে গিয়েছে। তাই সমাজ থেকে যদি তাকে কখনো সম্পর্কচ্যুত ও অমুখাপেক্ষী অবস্থায় না পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে তা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর মানুষ যতদিন মানুষ হিসেবে অবস্থান করবে ততদিন এটি তার জন্য স্বাভাবিক ও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

এটি এমন একটি স্বীকৃত সত্য যে, বিদ্যা ও জ্ঞানের কোনো যুগেও এ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা যায় না। প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক এরিস্টটল মানুষের সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসংগে বলেন ঃ

"মানুষ জন্মগতভাবেই একটি রাজনৈতিক জীব।"

—এরিস্টটলের রাজনীতি, ১২৫৩-ক

বলাবাহুল্য, রাজনীতি সমাজবদ্ধতার সর্বশেষ রূপের দ্বিতীয় নাম। কাজেই 'রাজনৈতিক জীব' শব্দের অর্থ হলো ঃ যে জীব চরম এবং পূর্ণভাবে সামাজিকতার অনুসারী। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে, মানুষের যে বিশেষ গুণ তাকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যময় করে তা হলো.

www.pathagar.com

তার এ সর্বশেষ পর্যায়ের সমাজপ্রিয়তা। এ গুণটি মানুষের মধ্যে না থাকলে মানুষ অন্যান্য জন্তুর ন্যায় নিছক একটি জন্তুতে পরিণত হতো।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন ঃ

"এক সাথে মিলেমিশে থাকা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ সত্যটিকেই জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এভাবে বিবৃত করে থাকেন যে, জন্মগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব।"–মুকদ্দমা ইবনে খালদুন

বর্তমান যুগের পণ্ডিত ও দার্শনিকদের কাছে এটি এমন একটি স্বীকৃত সত্য যে, এ সম্পর্কে কোনো প্রকার আলোচনা বা প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজনই তাঁরা মনে করেন না।

কুরআন মজিদ কোনো জীববিদ্যা বা সমাজবিদ্যার বই নয়। তাতে মানুষের সমাজপ্রিয়তা সম্পর্কে সরাসরি কোনো আলোচনার অবকাশও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ আলোচনার পরিসরে সেখানে যা কিছু বলা হয় তার পিছনে যেহেতু আরো অনেক তাত্ত্বিক সত্যের ন্যায় মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়, সেহেতু আলোচনা প্রসংগে সেখানে ঐ সব সত্যের দিকেও সুস্পষ্ট ইশারা করা হয়েছে। কুরআনের এ ইশারাসমূহ পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, কুরআন মজিদও মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে সমাজপ্রিয় বলে গণ্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কুরআন বলে যে,

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط ـ

"পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে তাদের সৃষ্টিকর্তা পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা ও করুণা সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

তখন পরোক্ষভাবে যেন সে একথাই বলে যে, মানুষকে মূলগতভাবে সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আখেরাতের সুখৈশ্বর্য ও জান্নাতের সম্পদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দানের সময় যখন সে জান্নাতবাসীদের সাথে একত্রে ওঠা-বসা, খাদ্যগ্রহণ ও আলাপ-আলোচনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করে[১] তখন সে যেন

---

১. যেমন, اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ "জান্নাতবাসীরা ভাই-বেরাদারের ন্যায় মুখোমুখি হয়ে আসনে বসে থাকবেন।"–সূরা আল হিজর ঃ ৪৭

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا ..... وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ـ

"তারা জান্নাতে শরাবপূর্ণ পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে---- এবং পরস্পরের দিকে মুখ করে কথা বলবে।"–সূরা আত তুর ঃ ২৩-২৫

www.pathagar.com

একথাই ঘোষণা করে যে, সমাজবদ্ধতা মানবপ্রকৃতির এমন একটি চাহিদা, যা থেকে এ পার্থিব জীবনেই শুধু নয়, আখেরাতের জীবনেও সে পৃথক থাকতে পারে না। সেখানেও মানুষ একমাত্র তখনই মানসিক স্বস্তি ও পূর্ণ আনন্দ লাভ করবে যখন সে স্ব-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভে সক্ষম হবে।

ইসলাম ও স্বভাবধর্ম

মানবপ্রকৃতির এ দিকটার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-স্বভাবের বিভিন্ন চাহিদাকে ইসলাম কি মর্যাদা দিয়েছে, তা অনুসন্ধান করতে হবে। ইসলামের চিন্তা ও কর্মব্যবস্থায় সমাজ ও তার বাস্তব চাহিদাসমূহ কোনো স্থানলাভের যোগ্য কিনা, যুক্তি ও নীতিগতভাবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের 'হৃদয় গঠন' করেছেন। وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا "মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।"–(সূরা আশ শামস ঃ ৭)। হৃদয় গঠন অর্থে কুরআন মজীদে 'তাসবিয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'তাসবিয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো কোনো জিনিসকে নিখুঁতভাবে গঠন করা। অন্যস্থানে এ কথাকে অন্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ ـ التين : ٤

"আমি মানুষকে সর্বাংগ সুন্দর করে তৈরি করেছি।"–সূরা আত-তীন ঃ ৪

এখানে সর্বাংগ সুন্দর অর্থ প্রকাশের জন্য 'আহসানি তাকবীম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'তাকবীমের' অর্থ হলো সোজা করা। যখন কোনো জিনিসের অভ্যন্তরীণ অর্থ ও তার গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তার অর্থ হয় ঐ জিনিসটিকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের উপযোগী করে তৈরি করা। কাজেই মানুষকে 'আহসানি তাকবীম' পয়দা করার অর্থ হলো এই যে, তাকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুযায়ী সর্বোত্তম আকৃতি দান করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে 'তাসবিয়া' করা অথবা 'আহসানি তাকবীমে' পয়দাকারীর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন এবং যে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তার প্রকৃতিকে ঠিক সেই উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। ঐ উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যেসব শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল এবং যেসব প্রবণতার সংমিশ্রণে তাকে প্রস্তুত করা উচিত ছিল, তার

www.pathagar.com

কোনো একটি হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়নি এবং ঐ শক্তি ও প্রবণতাগুলো ছাড়া অতিরিক্ত কিছু শক্তি ও প্রবণতা তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়নি।

একদিকে ইসলামের দৃষ্টিতে এ হলো মানব প্রকৃতির যথার্থ মর্যাদা, আবার অন্যদিকে ইসলাম বলে যে, একমাত্র আমার রাজপথে পদচারণা করেই মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে পূর্ণ করতে এবং জীবনের সকল কর্তব্য নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্যি বলবে যে, ইসলাম মানবপ্রকৃতিকে সামান্য অবহেলাও করবে না বরং এ প্রকৃতির ওপরই তার ভিত্তি স্থাপিত হবে। তার শিক্ষাবলী হবে এ প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত দাবীসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং এর অপ্রকাশিত অংশসমূহের ব্যাখ্যা। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের বাণী থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তির এ দাবী মিথ্যা নয়। আসলে একথাই সত্য যে, ইসলাম মানবপ্রকৃতিকে চুল পরিমাণও অবহেলা করে না। অবশ্যি তার ভিত্তি পরিপূর্ণভাবে এ প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط ـ

"সকল দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র ঐ দীনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো, আল্লাহর (তৈরি) সে প্রকৃতির অনুগত হও যার ভিত্তিতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ৩০

এটি এ সত্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, মানুষকে যে প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে তারই ওপর ইসলামের বুনিয়াদ রক্ষিত হয়েছে।

কুরআন মজীদ নিজেকে অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে ইসলামকে বিভিন্ন স্থানে 'যিকির' 'তাযকিয়া' ও 'যিক্‌রা' বলে উল্লেখ করেছে। এর শাব্দিক অর্থ হয় 'স্মারক'। কুরআন বা ইসলামের স্মারক হওয়ার একমাত্র এ অর্থ হতে পারে যে, তা এমন কোনো জিনিস নয়, যা বাইরে থেকে এনে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যার সাথে মোটেই পরিচিত নয়, বরং এমন জিনিস যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকে তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান। তা তার প্রকৃতির নীরব ধ্বনি। শব্দের ছাঁচে ঢালাই করে তার সামনে রাখা হয়েছে। সে এ নীরব ধ্বনিটি শুনতে পাচ্ছিল না। নিজের অভ্যন্তরের সত্যটি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রহমত আবার সে বিস্মৃত পাঠ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।—ইসলামের এ মর্যাদার কারণে তাকে অস্বীকার করাকে সে 'কুফর' আখ্যা দিয়ে থাকে। কুফরের শাব্দিক অর্থ হলো প্রচ্ছন্ন করা। অর্থাৎ ইসলামকে অস্বীকার করা যেন যে প্রকৃতির ওপর

www.pathagar.com

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে প্রচ্ছন্ন করা এবং তার উজ্জ্বল চেহারার ওপর সত্য বিরোধিতার কালো নেকাব ঢেকে দেয়ার নামান্তর। নবী করীম (স) বলেন ঃ

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ الْاِسْلاَمِ ـ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ـ بخارى

"ইসলামের প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃতির ভিত্তিতে কোনো শিশুকে সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ হয়ে থাকে যে,) তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে।"–বুখারী

অর্থাৎ একমাত্র ইসলামের সাথেই মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যেকটি শিশু বড় হওয়ার পর ইসলামকে অবলম্বন করতো, যদি এ ব্যাপারে বাইর থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হতো। কিন্তু সাধারণত এ হস্তক্ষেপ হয়। তাকে লালন-পালন করার সময় তার পিতা-মাতা ছোটবেলা থেকেই তার ওপর নিজেদের ধর্মের রং লেপন করতে থাকে। তাই বয়োপ্রাপ্ত হবার সাথে সাথেই সে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি উপাসক বা অন্য কোনো ধরনের অমুসলিমে পরিণত হয়। নয়তো কোনো শিশুর ওপর যদি এ ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ না হয়, তার পরিবেশের অস্বাভাবিক শক্তি তাকে কোনো একদিকে টেনে নিয়ে না যায় এবং তার আসল প্রকৃতিকে তার নিজস্ব জন্মগত অবস্থার ওপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়, তারপর তার সম্মুখে যদি বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষাসমূহ এক সাথে পেশ করা হয়, তাহলে ঐগুলোর মধ্যে সে একমাত্র ইসলামকেই গ্রহণ করবে। ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামের ওপর তার দৃষ্টি পড়লেই সে তার দিকে এমনভাবে দৌড়ে যাবে যেমন কোনো শিশু হাজারো মহিলার ভিড়ের মধ্যে শুধু নিজের মায়ের দিকে দৌড়ে যায়। এর কারণ এই যে, অন্যান্য ধর্ম মানবপ্রকৃতির রাজপথ থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই পিতা-মাতার শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব যার ওপর পড়েনি, সে ঐ ধর্মগুলোর মধ্যে নিজের জন্য কোনো আকর্ষণ অনুভব করবে না বরং তার সাথে অসম্পর্ক ও অপরিচয় অনুভব করবে এবং ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে। কেননা, সে একে পুরোপুরি তার প্রকৃতি অনুযায়ী পাবে। তার সাথে গভীর ভালবাসা ও প্রাণপ্রিয় সম্পর্ক অনুভব করবে। অর্থাৎ তার প্রকৃতি যদি হয় নিখাদ ইস্পাত তাহলে ইসলাম তার জন্য ভেজাল ও খাঁটিতে পার্থক্য সৃষ্টিকারী চুম্বক লোহা প্রমাণিত হবে।

www.pathagar.com

এ হাদীস ও যুক্তির আলোকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম আসলে প্রকৃতির মুখপাত্র এবং ঐ প্রকৃতির ওপরই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, "যে প্রকৃতি বিশিষ্ট করে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাহলো এ দীন—ইসলাম।"

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا دِيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

—রুহুল মাআনী ২১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

স্বভাবধর্মের সুস্পষ্ট দাবী

যদি ইসলাম স্বভাবধর্ম হয়ে থাকে এবং তার ভিত্তি যথার্থই মানব প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর যদি মানুষের সৃষ্টি-উদ্দেশ্যে যেসব শক্তি ও প্রবণতা দাবী করেছিল কেবল সেগুলোই তার প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এসবের সুস্পষ্ট ও অপরিহার্য দাবী হবে এই যে, ইসলাম মানুষের কোনো একটি প্রাকৃতিক শক্তি বা প্রবণতাকে নিষ্পিষ্ট করতে উদ্যত হবে না, কাউকেও নিজের পথের প্রতিবন্ধক মনে করবে না, কারোর সংগত দাবী উপেক্ষা করবে না এবং কারোর সাহায্য গ্রহণ করার ব্যাপারে গাফলতিও করবে না। কেননা, এসব সে একমাত্র তখনই করতে পারে যখন নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে সে অবশ্যি স্বীকার করবে ঃ এক, তার ভিত্তি যথার্থই মানব প্রকৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয়। দুই, স্রষ্টা মানবপ্রকৃতিতে এমন কিছু বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের জন্য পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় বরং ক্ষতিকর। তিন, সে মানুষকে কর্তব্যপালন ও সত্যিকার সাফল্যের পথ দেখাতে আসেনি। কিন্তু এর কোনো একটিকেও যখন সে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় বরং এগুলোকে দুনিয়ার বৃহত্তম মিথ্যা ও ভুল গণ্য করে, তখন এ অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি একথা বলতে বাধ্য হবে যে, প্রকৃতির এক একটি শক্তি ও প্রবণতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী অবশ্যি ইতিবাচক ও গঠনমূলক হওয়া উচিত। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের সংগত দাবীসমূহ স্বীকার করা, মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে তাদেরকে কার্যকরী মনে করা এবং তাদেরকে কাজে লাগাবার নির্দেশ দেয়া অপরিহার্য হওয়া উচিত।

ইসলামী শিক্ষার ওপর যে ব্যক্তির দৃষ্টি অগভীর ও অস্বচ্ছ নয়, তিনিই সাক্ষ দিবেন যে, ইসলামের দৃষ্টিভংগি বুদ্ধির সিদ্ধান্ত থেকে মোটেই

www.pathagar.com

ভিন্নতর নয়। সে মানুষের সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রবণতাকে নিশ্চিতভাবে এ মর্যাদা দেয়। তাদেরকে সকল দিক দিয়ে সম্মানার্থ মনে করে, তাদের দাবী পূরণ করার নির্দেশ দেয় এবং এ জন্য পথ নির্ধারণ করে। তাদেরকে দূষণীয় মনে করে উপেক্ষা করার ঘোর বিরোধিতা করে। আবার ঐ সব শক্তি ও প্রবণতাকে কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান এবং কোনো নেতিবাচক ভিত্তির ওপর তার এ দৃষ্টিভংগি ও চিন্তা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব কিছু নিয়েই যখন মানুষের জন্ম হয়েছে তখন এগুলোকে স্বীকার করতেই হবে, নিছক এ কারণে সে এগুলো পূরণ করে না। বরং দীন সম্পর্কে নিজের ধারণার মাধ্যমেই সে এ কাজ করে। তার নিকট এসব শক্তি ও প্রবণতা এমন সব উপায়-উপকরণের শামিল, যেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েই মানুষ তার সৃষ্টি-উদ্দেশ্যকে সুচারু ও সুন্দররূপে পূর্ণ করতে পারে। এ জন্যই তাদের দাবী পূরণ করাকে সে দুনিয়ার নয় বরং দীনের কাজ এবং ইবাদাত বলে গণ্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মানুষের মধ্যে পান-আহার, দৈহিক আরাম-আয়েশ, বংশ সংরক্ষণ, স্ত্রী-পুত্রের লালন-পালন, আত্মীয়স্বজনের দেখাশুনা করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে সে ক্রোধ, ঘৃণা, কাঠিন্য, যুদ্ধ বৃত্তি, যৌনস্পৃহা, বাকশক্তি, আনন্দানুভূতি ও দুঃখানুভূতির শক্তি নিয়ে জন্ম লাভ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এসব বস্তু দীন ও দীনদারীর মনোবৃত্তির সাথে কোনোপ্রকার সামঞ্জস্য রাখে না। বরং তাদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈপরিত্য দেখা যায়। কিন্তু ইসলাম বলে—না, এসব মানবপ্রকৃতির নির্যাস। এর মধ্যে কোনোটিও মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয় নয়। মানুষের ওপর যেমন তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের অধিকার আছে, অনুরূপভাবে তার নিজের আত্মার, দেহের, চক্ষু-কর্ণের পরিবার-পরিজনের ও আত্মীয়-বান্ধবেরও অধিকার আছে। এসব অধিকার আদায় করাও আবশ্যক।

اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِزَوْرِكَ حَقًّا ـ بخارى ـ كتاب الصوم

"তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার চোখেরও তোমার ওপর অধিকার আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর অধিকার আছে এবং তোমার প্রতিবেশিরও তোমার ওপর অধিকার আছে।

اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ـ

www.pathagar.com

"তোমার প্রতিপালকেরও তোমার ওপর অধিকার আছে এবং তোমার আত্মারও তোমার ওপর অধিকার আছে এবং তোমার পরিবার পরিজনেরও তোমার ওপর অধিকার আছে।"–বুখারী, কিতাবুস সাওম

اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَاَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ - بخارى، كتاب الصوم

"তোমার প্রতিপালকেরও তোমার ওপর অধিকার আছে, তোমার আত্মারও তোমার ওপর অধিকার আছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনেরও তোমার ওপর অধিকার আছে। কাজেই প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার দান করো।"–বুখারী, কিতাবুস সাওম

এমন কি নিজের জন্য ও নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করা যেন নেকীর কাজ বলে গণ্য হয়–

اِبْدَءْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا - مسلم، كتاب الزكوة

"নিজের আত্মা থেকে শুরু করো এবং তার ওপর সাদকা করো।"

مَهْمَا اَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِيْ اِمْرَأَتِكَ

"তুমি যা কিছু ব্যয় করেছো, সাদকার মধ্যে গণ্য হবে। এমন কি তোমার স্ত্রী যা কিছু খেয়েছে তাও সাদকা গণ্য হবে।"

–বুখারী, কিতাবুন নাফাকাত

لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ - بخارى، كتاب الصوم

"যে ব্যক্তি অত্যধিক নেকী অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনবরত রোযা রাখতে থাকবে সে এমন ভ্রান্ত গণ্য হবে, যেন সে আদতে রোযাই রাখেনি।"–বুখারী, কিতাবুস সাওম

বিবাহ করা ইসলামের দাবী ; একে এড়িয়ে গিয়ে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সম্পর্ক রাখার অধিকারী হতে পারে না।

اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ -
بخارى، كتب النكاح

"আমিও মহিলাদেরকে বিবাহ করেছি, সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।"

www.pathagar.com

মানুষের মনে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত থাকা উচিত।

تَزَوَّجُوْا اَلْوَدُوْدَ اَلْوَلُوْدَ - ابى داؤد، كتاب النكاح

"যে নারী অধিক সন্তান দেয় তাকে বিয়ে কর।"-আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - البقرة : ١٨٧

"আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েয করে দিয়েছেন তার আস্বাদন কর।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

আদর্শ মুসলিম অর্থাৎ নবীগণের একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন থাকতো।

وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً - الرعد : ٣٨

"তাদেরকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সম্পন্ন বানিয়ে ছিলাম।"

মু'মিন ব্যক্তি স্ত্রীদের যে ব্যয়ভার বহন করে তাও নেকীর কাজ বলে গণ্য হয়।

فِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ - مسلم، كتاب الزكوة

"(স্ত্রীদের জন্য) ব্যয় ভার বহন করা সদকা বলে গণ্য হবে।"

সত্য ও দীনের ব্যাপারে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ক্রোধ ও ঘৃণার প্রকাশও ঈমানের পূর্ণতার অপরিহার্য আলামত।

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসলো, আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা করলো, আল্লাহর জন্য কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর জন্য কাউকে নিষেধ করলো, সুতরাং সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো।"-মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৪ আবু দাউদের উদ্ধৃতি থেকে।

দীনের সংরক্ষণ ও সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করা শ্রেষ্ঠ নেকী বলে গণ্য হবে—

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ -

www.pathagar.com

"একজন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি উত্তম। অতপর রাসূল জবাবে বললেন, ঐ মু'মিন উত্তম, যে তার জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।"–বুখারী-কিতাবুল জিহাদ

এ ধরনের যুদ্ধের প্রেরণা থেকে যদি কারোর হৃদয় শূন্য থাকে তাহলে তা সত্যিকার মু'মিনের হৃদয় হতে পারে না ঃ

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ ـ

"যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু সে জিহাদ করেনি এবং জিহাদের চিন্তাও তার দিলে উদয় হয়নি, সে মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।"–মুসলিম ২য় খণ্ড

কুফর ও নিফাকের ব্যাপারে কোমল নয় কঠোর দৃষ্টিভংগী ঈমানের প্রাণ।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ـ الفتح : ٢٩

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহযোগিরা কাফেরদের প্রতি কঠোর।"–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯

বাকশক্তিকে নিষ্ক্রীয় করে রাখা ইসলামের নয়, জাহেলিয়াতের পদ্ধতি–

اِنَّ هٰذَا لَايَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ بخارى

"জাহেলিয়াতের কার্যাবলী গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ হবে না।"

নিজের ছেলেমেয়েদেরকে আদর করা ভালো অভ্যাস ও ইসলামী রুচিবোধের পরিচায়ক। অন্য দিকে নিজেকে এ থেকে আলাদা করে রাখা ভীষণ অপসন্দনীয় কাজ।

قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ..... فَقَالَ مَنْ لَايُرْحَمُ ـ

بخارى، كتاب الادب

"নবী করীম (স) হাসানকে চুমো দিচ্ছিলেন ..... তিনি বললেন, তাকেও দয়া করা হবে না।"–বুখারী, কিতাবুল আদব

নিজের আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা ও অশ্রু বিসর্জন দেয়া কোনো অপসন্দনীয় কাজ নয় বরং মানবতা ও করুণার প্রকাশ।

هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ ـ مسلم، كتاب الجنائز

"আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তকরণে এ রহমত সৃষ্টি করেছেন।"

www.pathagar.com

এসব সাক্ষ্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, ইসলাম স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবণতাকে দূষণীয় গণ্য করে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয় হলো এগুলোকে সুনজরে না দেখা, এগুলোকে গ্রহণ না করা এবং এগুলো কার্যকরী করাকে দীনদারীর বিরোধী মনে করা। যে বিজ্ঞ স্রষ্টা মানুষকে ও তার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন এ জীবনব্যবস্থা তিনিই প্রদান করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে এর মধ্য থেকে কোনো একটি শক্তিকে নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় গণ্য করা সম্ভব নয়। আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা হবার কারণে মূলগতভাবে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবণতাকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে মানুষকে পথ দেখিয়ে দেয়া, এগুলোর ভুল ব্যবহারের গতিরোধ করা এবং নির্ভুল ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া। আর সত্যি বলতে কি এটাই তার শ্রেষ্ঠতম গুণ এবং এ গুণটিই আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে অন্যান্য জীবন-ব্যবস্থা থেকে এবং ইসলামকে অনৈসলাম থেকে পৃথক করে।

স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলাম মানুষকে প্রত্যেকটি স্বাভাবিক প্রবণতাকে গুরুত্ব দান করে। তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তার অস্তিত্ব লাভের পিছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের কার্যকারিতা স্বীকার করে। এজন্য তার সঠিক দাবীসমূহ পূর্ণ করার ব্যাপারকে নিজের শিক্ষাব্যবস্থায় অবশ্যি স্থান দান করে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সামাজিক প্রবণতা—যা মানবপ্রকৃতির সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রবণতা—তাকে সে দূষণীয়, বর্জনীয় গণ্য করবে বা এড়িয়ে যাবে, এর কোনো কারণ থাকতে পারে না। একথা কোনোক্রমেই যুক্তি-সংগত বলে মনে হয় না। বিপরীতপক্ষে যুক্তি কেবল এটাই বলে যে, ইসলাম মানুষের এ স্বাভাবিক প্রবণতাকেও তার সৃষ্টি উদ্দেশ্যের জন্য অবশ্যি একটি প্রয়োজনীয় বস্তু মনে করে থাকবে এবং নিজের শিক্ষা-সমূহের মধ্যে তার দাবীগুলো যথার্থ স্থান লাভ করবে। উপরন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ ধরনের শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না এবং তার পুরোপুরি হক আদায় করতে অপারগ হয়, তাকে সে নিজের একজন ভ্রান্ত অনুসারী হিসেবে গণ্য করে থাকবে। আর যদি এটা যথার্থ না হয়, যদি সে সমাজ জীবন সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টিভংগি গ্রহণ না করে থাকে, তাহলে নিসন্দেহে বুদ্ধি ও ন্যায়ের আদালত তার বিরুদ্ধে নীতিহীনতা ও বৈপরীত্ব প্রিয়তার কঠোর অভিযোগ উত্থাপন করবে। তখন এ অভিযোগের বিপক্ষে কোনো সাফাই পেশ করা তার পক্ষে সহজ হবে না।

www.pathagar.com

ইসলাম তার স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা হওয়ার নীতিগত ও সুস্পষ্ট দাবীকে কতদূর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সমাজবদ্ধ জীবনের ধারণা এখানে কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে, এবার আমরা তা পর্যালোচনা করবো।

ইসলামে সমাজবদ্ধ জীবনের স্বীকৃত গুরুত্ব

নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাহ্ পর্যালোচনা করলেও একথা প্রমাণ হয় যে, ইসলামী চিন্তা ও কর্মব্যবস্থা সমাজবদ্ধ জীবনের কর্তৃত্বশূন্য নয়। বরং সেখানে তার গুরুত্ব ও দাবীসমূহের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর পর্যালোচনা যদি আরো সূক্ষ্ম ও গভীরতর হয়, তাহলে এ বিষয়টি সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। তখন দেখা যাবে যে, এ ব্যবস্থায় সমাজবদ্ধ জীবন এমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব অর্জন করেছে, যার সম্ভবত কোনো নজীর পাওয়া যাবে না। সম্ভাব্য সকল দিক দিয়েই এ গুরুত্বের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ দান করা হয়েছে। সামাজিক কার্যপদ্ধতি কার্যকরী করার যতটুকু সুযোগ থাকতে পারে তার সবটুকুতেই ইসলাম একে কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ দাবীর স্বপক্ষে আমরা যেসব প্রমাণ পেশ করতে পারি অথবা একে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ

১. ইসলামের সমাজবদ্ধ জীবনের ধারণা অর্থাৎ মানুষের যে অবস্থানকে তার সত্যিকার সামাজিক অবস্থান স্বীকার করে ইসলাম তাকে সম্বোধন করেছে।

২. শরীআতের যেসব বিধান মুসলমানদের দলীয় সংগঠন ও জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে বিধৃত।

৩. ইসলামের যেসব বিধানের মধ্যে জীবনের সাধারণ বিষয়াবলীকেও কোনো না কোনো প্রকার সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪. সমাজ জীবনের যেসব অনুষ্ঠানকে ফরয ইবাদাতের আওতায় আবশ্যিক গণ্য করা হয়েছে।

এখন এর প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

এক ঃ সামাজিক ধারণা

কোনো ধর্ম যখন তার অনুসারীদেরকে সম্বোধন করে তখন তার মনোজগতে মানুষের আসল মর্যাদা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা থাকে

www.pathagar.com

এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখেই সে তার শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করে। এ বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয় এবং তা ঠিকও হবে না। কেননা এটিই বিভিন্ন ধর্মের প্রকাশভংগি, তাদের বিধি-বিধান, মূল্যমান নির্ধারণ ও সীমা নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলোর দিকে লক্ষ না রাখলে তাদের শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে না এবং তা যুক্তিনির্ভরও হয় না।

যেসব বিষয় মানুষের আসল মর্যাদা ও তার প্রাকৃতিক অবস্থানের স্থান নির্দেশের প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে সমাজনীতি অন্যতম। প্রত্যেক ধর্মকে প্রথম দিনেই এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে হয়, মানুষ কি এমন একটি প্রাণী যাকে স্বহস্তেই নিজের জগত তৈরি করতে হবে অথবা অন্যান্য স্বগোত্রীয়দের সাথে এবং তাদের মধ্যে তাকে বাস করতে হবে ? আর যদি অন্যের সাথে মিলেমিশে বাস করতে হয় তাহলে এ মেলামেশার সীমানা কতদূর বিস্তৃত হবে এবং এর সম্পর্ক কতটুকু শক্তিশালী হবে ? স্বভাবত ইসলাম এসব প্রশ্নের একটি জবাব নির্ধারণ করেই মানুষকে সম্বোধন করেছে। মানুষকে একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পরই সে তার বিধান রচনা করেছে। এ জবাবটি কি ? এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক দিক দিয়ে মানুষের আসল মর্যাদা কি ? এসব জানার জন্য একদিকে যেমন ইসলামের এ বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا ـ الحجرات : ١٣

"হে মানবগোষ্ঠী! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোত্রে ও বংশে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

অন্যদিকে তেমনি তার কার্যাবলী নিরক্ষণ করা উচিত। তার শরীআতের ওপর সমাজ জীবনের গভীর ছাপ রয়েছে। তার বিধান ও নির্দেশাবলীর একটি বিপুল ও বিরাট অংশ মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আর এগুলোর আনুগত্যকেও সে অন্যগুলোর ন্যায় অপরিহার্য গণ্য করেছে। সে যেখানে আল্লাহর অধিকার নিয়ে আলোচনা করে সেখানে মানুষের অধিকারকেও পূর্ণ গুরুত্ব দান করে। সে কেবলমাত্র ইবাদাতের পদ্ধতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় না বরং সামষ্টিক জীবন যাপন করার

www.pathagar.com

জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ব্যবস্থাও দান করে। নৈতিক, সামাজিক, তমদ্দুনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, নাগরিক, দেশীয়, আন্তর্জাতিক তথা মানব-জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই যে সম্পর্কে তার কোনো বিধান নেই। জীবনের এমন কোনো পথ নেই যার চৌমাথায় তাঁর নির্দেশাবলী লটকানো নেই।

ইসলামের এ দ্ব্যর্থহীন বাণী ও তার সুস্পষ্ট কার্যাবলী যে সত্যের দ্বারোদঘাটন করে, তা কোনো আলোচনা, যুক্তিপ্রদর্শন অথবা কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয় দুটি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করে যে, মানুষকে সম্বোধন করার সময় ইসলাম তাকে সমাজ জীবনের সুউচ্চ স্থানে আসীন করেছে। তার শিক্ষাবলীর পটভূমিকায় মানুষের যে অবস্থান একটি স্বীকৃত অবস্থান হিসেবে বিদ্যমান, তাকে সন্দেহাতীতভাবে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন যাপনকারী প্রাণীর অবস্থান বলা যায়। ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে তার এছাড়া আর কোনো ধারণাই নেই যে, তারা একটি বংশ, গোত্র, জাতি ও সমাজের উপাদান। এগুলোর অংশ হিসেবেই তারা জীবন যাপন করে। ঘর-সংসার, ক্ষেত-খামার, হাট-বাজার, শিক্ষালয়, গবেষণাকেন্দ্র, পার্লামেন্ট, যুদ্ধক্ষেত্র ও চুক্তি-পরিষদ সর্বত্রই তাদের মানসিক সম্পর্ক ও প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই তাদেরকে সম্বোধন করার সময় তাদের এ স্বীকৃতি ও সত্যিকার অবস্থানটিকে অবশ্যি সামনে রাখতে হবে।

মানুষকে সম্বোধন করার সময় ইসলাম যদি এ ধরনের সামাজিক ধারণা পোষণ করে, তাহলে এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে, নিজের অনুসারীদের জন্য সমাজ জীবনকে সে একটি অপহার্য বিষয় মনে করে এবং একে এত বেশি অপরিহার্য মনে করে যে, মানুষকে এ থেকে পৃথক করার পর এ পৃথিবীতে তার জন্য সত্যিকার সম্বোধন করার মতো আর কিছুই থাকে না।

দুই ঃ সাংগঠনিক বিধান

ইসলাম নিসন্দেহে ব্যক্তিকে বিরাট ও মৌলিক গুরুত্ব দান করেছে। তার প্রাথমিক ও আসল বাণী ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই। ব্যক্তি যেমন একা জন্মগ্রহণ করেছে তেমনি আল্লাহর বিধান ও ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে নিজের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করাও তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। ভবিষ্যতে আল্লাহর সামনে নিজের কার্যাবলীর জবাবদিহি করার জন্য তাকে একাই হাযির হতে হবে। কিন্তু সেই সাথে ইসলাম একথাও বলে যে, যে পথ মানুষকে

www.pathagar.com

সাফল্যের মঞ্জিলে পৌছায় তা সমাজকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়নি বরং একটি সংগঠিত সমাজ জীবনের মাঝখান থেকে বের হয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই এ পথের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

"হে ঈমানদারগণ! ..... তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পৃথক হয়ে থেকো না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২-১০৩

'পৃথক হয়ে থেকো না' অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত হয়ে থেকো। এ 'পৃথক হয়ে না থাকা' ও 'পরস্পরে সংশ্লিষ্ট থাকা' কোন্ ধরনের ও কোন্ পর্যায়ের হওয়া উচিত। এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তিনি বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ -

"জামাআতকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।"-তিরমিযী ২য় খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা

اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি ঃ এক. জামাআতবদ্ধ জীবন, দুই. শ্রবণ (অর্থাৎ নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা) ; তিন. আনুগত্য (অর্থাৎ তার নির্দেশ মেনে চলা) ; চার. হিজরত ; পাঁচ. আল্লাহর পথে জিহাদ।"-আহমদ ও তিরমিযী মিশকাতের মাধ্যমে ৩২১ পৃষ্ঠা

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, ইসলাম যে সমাজ জীবনের নির্দেশ দেয় তা কোনো ঢিলেঢালা সমাজ জীবন নয়। নিছক নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তার কাঠামো তৈরি হয়নি। বরং ইসলাম সমাজ জীবনকে ঐক্য, সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে শ্রবণ ও আনুগত্যের লৌহতারের সাহায্যে কঠিনভাবে বেঁধে দিয়েছে।

উপরন্তু জামায়াতকে মযবুত করে আঁকড়ে ধরা এবং সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করা নিছক একটি নির্দেশ নয় বরং এমন একটি অপরিহার্য নির্দেশ যে, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে ঈমান ও ইসলাম থেকে সম্পর্কচ্যুতি ঘটতে পারে। কাজেই আবার বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرِ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ -

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয় নিসন্দেহে সে ইসলামের জোয়াল তার গলা থেকে নামিয়ে দিয়েছে।"

–আহমদ ও তিরমিযী

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের নেতার আনুগত্য পরিহার করে এবং মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যায় অতপর সে মৃত্যুবরণ করলো তাহলে তার মৃত্যু হলো জাহেলিয়াতের মৃত্যু।"–মুসলিম ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা

'আল জামাআত' থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেমন মুসলমানদের জন্য ঈমান বিরোধী কাজ, অনুরূপভাবে সামাজিক শৃংখলার সাথে সম্পর্কযুক্ত না হওয়াও দীনের দিক থেকে নিতান্ত ভয়াবহ ব্যাপার।

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

"যে ব্যক্তি মরে যায় কিন্তু তার গলায় (মুসলমানদের নেতার) বাইয়াত নামা (আনুগত্যের শপথ) ঝুলন্ত থাকে না তাহলে তার সেই মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।"–মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা

যে আল জামাআত এ বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন এবং যে সামাজিক শৃংখলা থেকে সম্পর্কচ্যুতি মুসলমানকে জাহেলিয়াতের সীমান্তে পৌঁছে দেয়, নিসন্দেহে তার বিরোধিতা করা অথবা তার পথে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকে ইসলাম মুহূর্তকালের জন্যও বরদাশত করতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ۔

"কোনো উম্মাত যখন ঐক্যবদ্ধ থাকে, তখন যে ব্যক্তি তাকে ছিন্নভিন্ন করতে চায় তাকে (সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে) তলোয়ার দিয়ে আঘাত করো, সে যে-ই হোক না কেন।"–মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা

অন্যদিকে যারা এ সামাজিক শৃংখলার বাস্তবরূপ—ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযত ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য জীবন দান করতে প্রস্তুত স্বাভাবিক-ভাবেই তাদের মর্যাদা ও প্রতিদানকে বিরাট ও মহান গণ্য করা হয়েছে।

"এক দিবারাত্রি সীমান্ত প্রহরা অনবরত এক মাস নামায পড়া ও রোযা রাখা থেকে উত্তম। আর ইত্যবসরে যদি কারোর মৃত্যু ঘটে যায়,

www.pathagar.com

তাহলে জীবদ্দশায় সে এভাবে যে নেকীর কার্য সম্পাদন করতো তা বরাবর সম্পাদিত হচ্ছে বলে গণ্য হবে এবং এর প্রতিদান সে লাভ করতে থাকবে। উপরন্তু তা ফিতনা সৃষ্টিকারীদের হাত থেকেও নিরাপত্তা লাভ করবে।"–তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা

অনুরূপভাবে এ শৃংখলা ও সংগঠনের আনুগত্যকে ঈমানের প্রয়োজনীয় আলামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নেতৃস্থানীয়দের আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য গণ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ-

"যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমীরের নাফরমানি করে সে আমার নাফরমানি করে।"

–মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা

আমীরের আনুগত্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি এবং শেষ বিন্দু পর্যন্ত কর্তব্য সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন কি অসৎবৃত্তি ও কর্মের আবর্জনার স্তূপে যেসব নেতার সর্বশরীর ডুবে যায় এবং যাদের আঘাতে প্রজাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়, তাদের বাইআত ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ারও অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ এসব কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে নিতান্ত ঘৃণ্য। কিন্তু এ সত্ত্বেও সে নিজের অনুসারীদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে এসব যুলুম বরদাশত করার এবং তাদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ না করে বরং ভালো কাজে তাদের আনুগত্য করে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইসলাম এমন অস্বাভাবিক সংযমের পরিচয় দিল কেন ? যালেম ও ফাসেক নেতৃত্ব সম্পর্কে সে মুসলমানদেরকে এ চরম ধৈর্য ও তিতিক্ষার নির্দেশ দিল কেন ? এর কারণ হলো এই যে, এর ফলে মুসলমানদের সমাজ সুরক্ষিত থাকবে এবং তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হবে না। ইমাম নববী এ ধরনের বিভিন্ন হাদীস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

هذه الاحاديث فى الحث على السمع والطاعة فى جميع الاحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فان الخلاف سبب لفساد احوالهم فى دينهم ودنياهم-

"এ হাদীসসমূহ নেতৃবৃন্দের হুকুম সর্বাবস্থায় শ্রবণ করা ও মেনে নেয়ার অপরিহার্যতার উপর জোর দেয়ার জন্য বিবৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

হলো মুসলমানদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। কেননা বিরোধ তাদের জন্য ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ধরনের দূরাবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

–শারহে মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সামাজিক শৃংখলা ও জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য যেসব নির্দেশ দিয়েছে, এগুলো তারই সংক্ষিপ্তসার। যদি কেবল এ গুটিকয়েক উদ্ধৃতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে ইসলাম সমাজ জীবনকে যে মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছে তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিতে মুসলমানদের একটি বিশেষ বন্ধনে (হাবলুল্লাহ) আবদ্ধ থাকা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকা যদি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, মুসলমানদের ওপর খিলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যদি অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে, যদি মুসলমানদের নেতার আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নামান্তর হয়, যদি মুসলমানদের জামাআত থেকে এক বিঘত বিচ্যুতিও মু'মিনকে ইসলামের সীমা বহির্ভূত করে, যদি ইমামের বাইআতের মুখাপেক্ষী না হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলা হয়, যদি আল জামাআতের ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টিকারীর রক্তের কোনো মূল্য না থেকে থাকে এবং যদি মিল্লাতের সামষ্টিক ব্যবস্থার (ইসলামী রাষ্ট্র) সংরক্ষণের চেয়ে বড় কোনো ইবাদাত না থাকে—তাহলে চিন্তা করুন ইসলামের সমাজ জীবন কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভের অধিকারী, কিন্তু বাস্তবে সে তা লাভ করতে পারেনি।

তিন ঃ সাধারণ সামাজিক বিধান

'সমাজ জীবন' ও 'সামাজিক জীবন ব্যবস্থা' শব্দগুলোর মাধ্যমে সাধারণত যে উচ্চতর ও ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা বড় জোর একটি সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সাধারণ সমাজ সীমায় এটিকেই সমাজ জীবনের উন্নত মান ও চরম পূর্ণতা মনে করা হয়। আর রাষ্ট্রের কর্মসীমা ও প্রভাব বহির্ভূত অবশিষ্ট জীবনকে সমাজ জীবনের আওতা বহির্ভূত ও তার সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম এ সাধারণ দৃষ্টিকোণের সাথে একমত না হয়ে সামনে অগ্রসর হয়। ইসলাম কোনো না কোনো প্রকার সামগ্রিক শৃংখলার মাধ্যমে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশসমূহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি ঃ

www.pathagar.com

[১] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا امروا عليهم احدهم -

"কোনো জনশূন্য এলাকায় তিন ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেই অবস্থান করতে পারে।"

–মুনতাকা, ৩৩০ পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, কোনো স্থানে যদি তিনজন মুসলমান থাকে, এমন কি যদি তারা কোনো জনমানবহীন বিরাণ এলাকায় অবস্থান করে তাহলেও তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে অন্য দুজনকে তার নেতৃত্বাধীনে অবস্থান করতে হবে। এ সমাজ ও সংগঠন বরং অন্য কথায় এ ক্ষুদ্র 'রাষ্ট্রীয় সংগঠন' ছাড়া তাদের জীবন ইসলামী জীবনের আওতায় প্রবেশ করতে পারবে না।

[২] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -

"তোমাদের থেকে তিনজন যখন কোনো সফরে বের হয়, তখন একজনকে নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করো।"

–আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য সফরের মত একটি সাময়িক ব্যাপারেও সংগঠন, শৃংখলা ও নেতা ছাড়া অবস্থান করার অনুমতি নেই। তিন ব্যক্তিও যদি একত্রে সফর করে, তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজ নকে সফরের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তার নেতৃত্বে সফর না করলে তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী হবে।

[৩] হযরত আবু সা'লাব খাশানী (রা) বলেন, সফরকালে কোথাও শিবির স্থাপন করলে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে নিজেদের পসন্দসই জায়গা বেছে নেয়া লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স) একবার এ পরিস্থিতি লক্ষ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন ঃ

اَنْ تَفَرَّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابَ وَالْاَوْدِيَةِ اَنَّهَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ -

"একমাত্র শয়তানের কারণে তোমরা এভাবে বিভিন্ন উপত্যকায় ও ময়দানে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছো।"–আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করার ফলে এরপর থেকে লোকেরা আর কখনো এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকেনি। এরপর থেকে যখনই কোথাও শিবির স্থাপন করা হতো লোকেরা মিলেমিশে অবস্থান করতো। এমন কি ধারণা হতো যে, একটি চাদরের নিচে তাদের সবাইকে ঢেকে দেয়া যাবে। (ঐ)

বুঝা গেল, কোনো দলীয় শৃংখলা ছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ সফর তো দূরে থাক, এ সফরকালে যদি কোথাও সাময়িকভাবে কয়েক ঘন্টা শিবির স্থাপন করে পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করা হয় এবং এ সামান্যক্ষণের অবস্থানও দলীয় শৃংখলা ও সমাজবদ্ধতার গুণে গুণান্বিত না হয়, তাহলে এটি সম্পূর্ণ ইসলামের অনভিপ্রেত। ইসলাম একে শয়তানের আনুগত্য গণ্য করেছে।

[৪] জনৈক সাহাবী কোনো উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন একটি মিঠা পানির ঝরণা। ঝরণাটি তাঁকে প্রলুব্ধ করলো। মনে মনে ভাবলেন, আহা, লোকালয় ছেড়ে যদি এখানে এসে বসবাস করতাম! এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি পৌঁছলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে। মনের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ

لاَتَفْعَلْ فَاِنْ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا۔

"না, এ কাজটি করো না। কেননা তোমাদের আল্লাহর পথে অবস্থান করা গৃহে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।"

–তিরমিযী, ১ম খণ্ড

এ হাদীস থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, সমাজ জীবন পরিহার করে নির্জনবাসী হওয়া পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে যত বেশি লাভজনক মনে হোক না কেন, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এ পন্থা অবলম্বন করার এবং সমাজচ্যুত জীবন যাপন করার অনুমতি দেয় না। কেননা একটি সুশৃংখল ইসলামী সমাজের মধ্যে অবস্থান করে একজন মুসলমান যেভাবে লাভবান হয় এ ধর্মীয় ও পার্থিব লাভ যত বিরাটই হোক না কেন তার তুলনায় কিছুই নয়।

স্বাভাবিক অবস্থা ও সফর অবস্থা সম্পর্কিত এসব ইসলামী বিধান ইসলামী চিন্তা ও কার্যব্যবস্থার মধ্যে সমাজ জীবনের প্রয়োজন ও গুরুত্বের বিপুল মর্যাদা দান করেছে। নিসন্দেহে এটি একটি বিরাট সত্যের দ্বারোদঘাটন করে। এর অস্তিত্বের সন্ধান কেবলমাত্র ইসলামেরই মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ ও ব্যবস্থাসমূহ এর সাথে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জীবনের সামগ্রিক দাবী কেবল খিলাফতের বিধানসমূহ কার্যকরী করার পর শেষ হয়ে যায় না বরং এ সীমার বাইরের সাধারণ জীবনকেও নিজের আওতাভুক্ত করে। এর অর্থ হলো এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ জীবনের গুরুত্ব শুধু বিরাটই নয়, ব্যাপক এবং সার্বজনীনও। এমনকি মানুষের কোনো সাধারণ বসতিও এর প্রভাবমুক্ত নয়। আল্লামা শওকানী (র) এ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

- "এ হাদীসগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, তিনজনের বেশি মুসলমান কোথাও অবস্থান করলে শরীআতের নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করতে হবে। কেননা এভাবেই পারস্পরিক মতবিরোধ থেকে সংরক্ষিত থাকা সম্ভব। .... যদি তিন ব্যক্তি বনের মধ্যে অবস্থান করে অথবা এক সাথে সফর করে এবং তাদের জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান কোনো গ্রাম বা শহরে একসাথে অবস্থান করে সেখানে তাদের জন্য অবশ্যি এ নির্দেশ অপরিহার্য হবে।"

–নাইলুল আওতার, ৯ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা

চার ঃ ইবাদাতের সামগ্রিক অনুষ্ঠানাদি

মানব জীবনের যে বিভাগটিকে সাধারণ প্রচলিত ধারার প্রেক্ষিতে ইবাদাতের বিভাগ বলা উচিত, সেটি এমন একটি বিভাগ যেখানে সমাজবদ্ধতার ধারণার অনুপ্রবেশ বড়ই কঠিন। আল্লাহর ইবাদাতের নাম নেয়ার সাথে সাথেই নির্জনতা ও নিরিবিলি অবস্থানের চিত্র ভেসে ওঠে। মনে হতে থাকে যে, ইবাদাত একটি নির্ভেজাল ধর্মীয় ও পারলৌকিক কাজ। কোনো দিক দিয়েও এটা কোনো পার্থিব কাজ নয়। অতপর তাকে প্রকাশ্য স্থানের বিষয়বস্তুতে পরিণত করা কেমন করে সম্ভব! গৃহের, মহল্লার, পল্লীর তথা সমগ্র দেশের জনগণের জীবনকে অবশ্যি সামগ্রিক সংগঠনের মুখাপেক্ষী বলা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যও যে সামগ্রিকতার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে, একথা যেন কোনোক্রমেই বোধগম্য হয় না। আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ইবাদাত প্রকৃতিগতভাবেই চারপাশের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রত্যাশী। সারকথা হলো এই যে, ইবাদাতগৃহ ও উপাসনালয়গুলো এমন সব স্থান যেখানে অন্য কোনো কাজ অপসন্দনীয়। এখন যদি দেখা যায় যে, কোনো ধর্ম ইবাদাতের মধ্যে কতিপয় সামগ্রিক আনুষ্ঠানিক ইবাদাতকে অপরিহার্য গণ্য করেছে, তাহলে

www.pathagar.com

বলা যায় যে, সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধতাকে গুরুত্বদান করার ব্যাপারে সে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় যদি একথা জানার প্রয়োজন হয় যে, এ দীনে সমাজবদ্ধতার গুরুত্ব কতটুকু, তাহলে এ ব্যাপারে সে নিজের ইবাদাতে যেসব সামগ্রিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে তার মাধ্যমেই তা সবচেয়ে বেশি করে জানা সম্ভব। এ অনুষ্ঠানাদির সংখ্যা যত বেশি হবে এবং তাদেরকে যত বেশি প্রয়াজনীয় গণ্য করা হবে নিসন্দেহে এ দীনে সমাজবদ্ধতার স্থান ততই উন্নত হবে।

ইসলাম এমন একটি দীন যার ইবাদাতের মধ্যে অবশ্যি সামগ্রিক অনুষ্ঠানাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ অনুপ্রবেশের মাত্রা কতটুকুন এবং তা কতটুকু গুরুত্বের অধিকারী এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিচে দেখুন ঃ

১. নামায ঃ এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম নামাযের আলোচনা করা উচিত। কেননা ইবাদাতগুলোর মধ্যে এটিই বৃহত্তম এবং সমগ্র দীনের নির্যাস ও বন্দেগীর উৎস। এবং এটিকে মূল স্তম্ভ (ইমাদুদ দীন) বলা হয়েছে। এ ইবাদাতটিকে যেসব শর্ত ও অনুষ্ঠানসহ আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তার মধ্যে শামিল ঃ

ক. নামায পড়ার সময় প্রত্যেক মুসলমানকে একমাত্র কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা উচিত।

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ البقرة : ١٤٤، ١٥٠

"এবং তোমরা যেখানেই থাকো না কেন নিজেদের মুখ ঐ দিকে (কা'বা-শরীফ) ফিরিয়ে রাখো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৪, ১৫০

কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার উপরেই মুসলমান হওয়া নির্ভরশীল।

وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمِ

"যে আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং আমাদের জবেহকৃত পশু খায় সেই মুসলমান।"–বুখারী, প্রথম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা

একটি বিশেষ স্থানের দিকে মুখ করার বলিষ্ঠ নির্দেশ দান করা হয়েছে। অথচ নামায যে আল্লাহর স্মরণের নাম তিনি সর্বত্র ও সর্বদিকে রয়েছেন, কোনো বিশেষ স্থানে বা দিকে আবদ্ধ নন। যেমন কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط ـ البقرة : ١١٥

www.pathagar.com

"যেদিকে তোমরা মুখ ফিরাও না কেন আল্লাহ সেদিকেই আছেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৫

খ. সমস্ত নামাযের মধ্যে আসল হচ্ছে ফরয নামায। এগুলোকে সবাই মিলে একত্রে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জামাআতের সাথে নামায পড়লে একাকী নামায পড়ার তুলনায় সাতাশগুণ বেশি সওয়াব হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।–বুখারী, ১ম খণ্ড

জামাআতের সাথে নামায পড়ার অপরিহার্যতা এ থেকেই প্রমাণিত হতে পারে যে, কিছু লোক বিনা ওযরে নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত ছিল। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'আমার ইচ্ছা হয় কাউকে আমার পরিবর্তে নামায পড়াবার জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়ে যারা জামাআতে উপস্থিত হয়নি তাদের নিকট যাই এবং হুকুম দেই যে, কাঠ সাজিয়ে তাদের গৃহে আগুন লাগিয়ে দাও।'–মুসলিম, ১ম খণ্ড

দয়া ও করুণার মূর্তপ্রতীক মহানবী (স) একথা বলেছেন। জামাআত ত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পর্কে মহানবীর মুখ থেকে এ কঠোর ও ভীষণ শব্দ উচ্চারণ একথাই ব্যক্ত করে যে, জামাআতের সাথে নামায না পড়া কোনো সহজ বা সাধারণ দোষ নয় বরং একটি মারাত্মক গুনাহ।

গ. নামায একত্রে ও জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য শুধু প্রত্যেকের নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসে এক স্থানে একত্রিত হয়ে নিজেদের মর্জিমত আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হলে চলবে না। বরং প্রত্যেককে কাতারবদ্ধ হয়ে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং কাতারগুলো তীরের মত সোজা হতে হবে।–বুখারী, ১ম খণ্ড

অতপর সবার মধ্য থেকে সবচেয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিকে সমগ্র জামাআতের ইমামতি করতে হবে। তিনি সবার অগ্রভাগে দাঁড়াবেন, পেছনের সমস্ত লোক তাঁর অনুসরণ করে এ ফরযটি আদায় করবে। অনুসরণ এমন পূর্ণাঙ্গ হতে হবে যেন সমগ্র জামাআতের প্রত্যেকটি কাজ ইমামের কাজের পুনরাবৃত্তি হয়। সমগ্র জামাআত ইমামের সাথে দাঁড়াবে, তাঁর সাথে ঝুঁকবে, তাঁর সাথে সিজদা করবে, তাঁর সাথে বসবে। যখন ইমাম কুরআন তেলাওয়াত করবেন সবাই চুপ থাকবে ও একমনে তাঁর কেরাত শুনবে। নামায আদায় করার ব্যাপারে তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি হলেও তাঁর অনুসরণ থেকে বিরত থাকার কোনো অবকাশ নেই। 'সুবহানাল্লাহ' উচ্চারণ করে ভুল সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

কাতার বন্দী হওয়া ও ইমামের অনুসরণ করা এ দুটি নিছক নামাযের ফযিলতের মধ্যে গণ্য নয়, বরং জামাআতের সাথে নামায পড়ার শর্তের মধ্যে শামিল। এদের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা নামাযকেও ত্রুটিপূর্ণ বরং অর্থহীন করে দেয়। এর ফলে কেবল পরকালীনই নয়, পার্থিব জীবনও ধ্বংসের বিভীষিকায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তির বক্ষদেশ লাইন থেকে সামান্য বাইরে বের হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (স) সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন ঃ

عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ـ

"হে আল্লাহর বান্দা নিজেদের লাইনগুলোকে অবশ্যি সরল ও সোজা রাখো, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরস্পরের বিপরীতমুখী করে দেবেন।"–মুসলিম, ১ম খণ্ড

আর একবার রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযের কোনো লাইনকে সংযুক্ত করবে, আল্লাহ তাকে সংযুক্ত করবেন আর যে ব্যক্তি কোনো লাইন ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন।"–আবু দাউদ

অনুরূপভাবে ইমামের অনুসরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি ইমামের আগে (যেমন রুকূ'র আগে) নিজের মাথা ওঠায় তখন সে কি ভয় করে না যে আল্লাহ তাআলা তার মস্তককে গাধার মস্তকে পরিণত করবেন ?"–মুসলিম, ১ম খণ্ড

ঘ. নামায জামাআতের সাথে ও একজন ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ার এ সাধারণ নির্দেশ অবশ্যি 'মহল্লাভিত্তিক'। অর্থাৎ এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ও শহরের প্রত্যেক মহল্লার লোককে নিজেদের পাঁচবার ফরয নামায মহল্লার মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে শরীআত শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় না বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে নির্দেশ দেয় যে, সপ্তাহে একটি নামায এমনভাবে পড়তে হবে যাতে সমগ্র গ্রাম বা শহরের জনসমাজ একটি মসজিদে একত্রিত হয়ে একই স্থানে, একই ইমামের পেছনে, একই সাথে নিজেদের প্রতিপালক রবের সামনে মাথানত করতে পারে। এটি হলো জুমার নামায। সূরা জুমায় এ নামাযের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তাহলো এই যে, মুসলিম জাতি তার কর্তব্য তখনই যথাযথভাবে পালন করতে পারে যখন তার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি তার সত্যিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নিজের সত্যিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে সমস্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে জুমার নামাযের প্রতিষ্ঠা অন্যতম। যদি

www.pathagar.com

মুসলমানরা এ নামাযের হক আদায় না করে, তা হলে তারা আল্লাহর সেই আইনের আওতায় পড়তে পারে যার আওতায় পড়ে অতীতের জাতিসমূহ (বিশেষ করে ইহুদী জাতি) বিপুলভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। এর সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যশীল নির্দেশ ও সতর্কবাণী রাসূলুল্লাহ (স)-ও দান করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "লোকদের জুমার নামায পরিহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ করে দেবেন এবং তারা হক থেকে গাফেল হয়ে যাবে।"–মুসলিম

ঙ. নামাযে যেসব কথা উচ্চারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন اِيَّاكَ نَعْبُدُ (হে আল্লাহ আমরা তোমারই বন্দেগী করি!), اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা তোমারই সাহায্য চাই!), اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (আমাদেরকে সোজা পথে চালাও)!), رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা তোমার!), اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ (আমাদের সবার ওপর এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ইত্যাদি। এর পরিষ্কার অর্থ হলো এই যে, নামায পড়ার সময় লোকদের বাইরের দিক থেকে যেমন ঐক্যবদ্ধ ও কাতারবন্দী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে মানসিক দিক দিয়েও পারস্পরিক ঐক্য ও একাত্মতার অনুভূতি জাগ্রত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ নির্দেশগুলো ছাড়া নামায সত্যিকার নামাযে রূপান্তরিত হতে পারে না। এগুলো সুস্পষ্ট সামগ্রিক অনুষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য নামাযকে সামগ্রিক চেতনা এবং সুশৃঙ্খল ও নিয়মের উৎস ধারায় পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলমান যখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে বরং নিজের পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয় তখনও একটি সমষ্টির অংশ হওয়ার অনুভূতি তার জন্য একটি বাস্তব সত্যে রূপ লাভ করবে। সে একাগ্রতার মাহেন্দ্রক্ষণেও নিজেকে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তি মনে করবে না, যে নিজের কর্তব্য, জীবনোদ্দেশ্য ও স্বার্থাবলীর প্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল ঈমানদারদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন থাকে এবং ঐসব কর্তব্য সম্পাদন এবং জীবনোদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখে না এবং সম্পর্কের প্রয়োজনও অনুভব করে না। বিপরীত পক্ষে সে নিজের দোয়া ও গুযারিশসমূহ থেকেও এ সত্যটি বার বার উদঘাটিত করে যে, তার মধ্যে নিজের পৃথক সত্তা ও সমষ্টির সাথে নিবিড়তম সম্পর্কের অনুভূতি বিদ্যমান। সে স্থলভূমির

www.pathagar.com

পথিক নয় যে, একাই গন্তব্যে পৌছে যাবে। বরং সে হলো কিশ্‌তির যাত্রী, সাধারণ অবস্থায় কিশ্‌তির সকল যাত্রীর সাথেই সে গন্তব্যপকুলে পদার্পণ করতে পারে।

নামাযের ঐসব সামষ্টিক অনুষ্ঠান ও তাদের পেছনে সক্রিয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্দাজ করুন যে, এ ইবাদাতের সামগ্রিকতার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি কত গভীর ও দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং এ থেকে ইসলামে সমাজবদ্ধতার স্থান কত বিরাট ও উন্নত প্রতীয়মান হয়! কিন্তু যতক্ষণ না নামাযের মৌলিক উদ্দেশ্য ও তার আসল লক্ষের সাথে এ অনুষ্ঠানগুলোর সম্পর্কের অবস্থাও দৃষ্টিসমক্ষে থাকবে ততক্ষণ এ আন্দাজ নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ হবে না। নামাযের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি ও তাঁর স্মরণ। আর আল্লাহর স্মরণের প্রাণ হলো হৃদয়ের বিনম্রতা। এ দুটি সুপরিচিত সত্য। চিন্তা করুন, নামাযের এ আসল উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য কোন্ স্থানটি বেশি উপযোগী হতে পারে ? নির্জন গৃহকোণ অথবা কোলাহলমুখর জনসমাজ ? আল্লাহর স্মরণে নিমগ্নতা নির্জনতার শান্ত পরিবেশ চায়, না শান্তি ভঙ্গকারী কোলাহলপূর্ণ স্থান ? হৃদয় নম্রতার অমূল্য সম্পদ নির্জন পরিবেশে অনায়াসে লাভ করে, না নিরবতা ভঙ্গকারী পরিবেশে ? নিসন্দেহে এ প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব হবে। প্রত্যেকেই বলবে যে, আল্লাহর স্মরণের জন্য হৃদয়ের পূর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন। আর হৃদয়ের পূর্ণ একাগ্রতা নির্জনতার শান্তির প্রত্যাশী।

একদিকে নামাযের এ আসল উদ্দেশ্য ও তা সম্পাদন করার ধরন দেখুন এবং অন্যদিকে শরীআতের এ নির্দেশ শুনুন যে, ফরয নামাযের জন্য সমষ্টি অপরিহার্য এবং একাকীত্ব ক্ষমাহীন অপরাধ। আবার সমষ্টিও নিছক সমষ্টি নয় বরং অত্যন্ত উন্নত মানের ও আঁটসাট করে বাঁধা সমষ্টি। কাতার বাঁধতে হবে, কাতারগুলোকে তীরের ন্যায় সোজা করতে হবে, মুসল্লীদের পরস্পর মিলেমিশে ও ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াতে হবে, ইমামের অনুসরণ করে তাঁর ইংগিত অনুযায়ী সবাইকে একসাথে দাঁড়াতে হবে, এক সাথে ঝুঁকতে হবে, এক সাথে বসতে হবে, এক সাথে সিজদা করতে হবে এবং এক সাথে নামায শেষ করতে হবে। এ সমস্তই অপরিহার্য। দৃশ্যত বিষয়টি কতই অদ্ভূত মনে হয় যে, নামাযের প্রতিষ্ঠা এমন সব অনুষ্ঠান ও শর্তসাপেক্ষ যেগুলো মনের একাগ্রতা ও হৃদয় অভ্যন্তরের নম্রতার শান্ত পরিবেশে বার বার ব্যাঘাত ঘটায়! চিন্তার বিষয় হলো এই যে, এমনটি কেন করা হলো ? যে বিষয়গুলো নামাযের আসল উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটাতে সক্ষম সেগুলোকে নামাযের মধ্যে শুধু বরদাশতই করা হয়নি বরং

www.pathagar.com

অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে কেমন করে ? এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আপনি যে সিদ্ধান্তে পৌছবেন, তাতে অবশ্যি একথা প্রতীয়মান হবে যে, মুসলমানদের মধ্যে সুশংখল সমষ্টির অনুভূতি জাগ্রত ও সুদৃঢ় রাখা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অত্যন্ত বরং অস্বাভাবিক প্রিয় ছিল। নামাযের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনেও জটিলতা সৃষ্টি হবার প্রকাশ্য সম্ভাবনার ওপর এ চেতনার জাগৃতি ও দৃঢ়তাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১] এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে একথাই প্রমাণ হয় যে, জাতির মধ্যে সুবিন্যস্ত সমষ্টির অনুভূতি জাগ্রত রাখা নামায প্রতিষ্ঠার একটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য।[২]

২. যাকাত ঃ নামাযের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো যাকাত। যাকাত আদায় করা ইসলামের দুটি মৌলিক আলামতের অন্যতম, যা কোনো অমুসলমানের ইসলামের সীমান্তে প্রবেশ করা বা না করা সম্পর্কে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এ ইবাদাতটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ -

"আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে তা অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।"–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বাণী থেকে দুটি বিশেষ কথা জানা যায়—এক. এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটির উদ্দেশ্য ও লক্ষের একটি দিক (বাইরের দিক) ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে জড়িত। অর্থাৎ একে যে

---

১. কাজেই এ বিষয়ে আলেমগণ ঐকমত্যে পৌছেছেন যে, কোনো ব্যক্তি নির্জনে নামায পড়ার ফলে যদি তাতে পূর্ণ একাগ্রতার সৃষ্টি হয় কিন্তু জামাআতের সাথে নামায পড়ার ফলে তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হতে থাকে তাহলেও তার জন্য একাকী ফরয নামায আদায় করা ও জামাআতে অংশগ্রহণ পরিহার করা জায়েয নয়। একমাত্র ইমাম গাযালী (র) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি জামাআতে অংশগ্রহণ করার ওপর হৃদয়ের একাগ্রতাকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। কিন্তু তাঁর এ রায়কে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয়নি।–মিশকাতের ৯৬ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন

২. এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করতে গিয়ে যদি নামাযের আসল উদ্দেশ্য (আল্লাহর স্মরণ) সম্পাদনে বিঘ্ন ও জটিলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে শরীআত এ বিষয়টি এমনি ছেড়ে দেয়নি বরং এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থাও করেছে। তাহলো এই যে, শরীআত যেখানে ফরয নামাযসমূহকে এ ধরনের উন্নত সামগ্রিক অনুষ্ঠানসহ আদায় করার হুকুম দিয়েছে সেখানে অন্য সমস্ত নামাযকে মসজিদের পরিবর্তে নিজ নিজ ঘরে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ صَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلٰوةِ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ "নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করো। কেননা লোকেরা নিজেদের ঘরে যে নামায আদায় করে সেটিই হলো সর্বোত্তম নামায, তবে ফরয নামাযগুলো ছাড়া।"–বুখারী। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও এ পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি নফল ও সুন্নাত নামাযসমূহ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে তার মধ্যে একথাও শামিল আছে যে, জাতির অভাবী ও দরিদ্র লোকেরা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সংকটের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যেন অসহায় হয়ে না পড়ে। দুই. এ ইবাদাতের পদ্ধতি হলো, যাকাতের অর্থ বিত্তশালী মুসলমানদের নিকট থেকে আদায় করে অভাবী মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। এর পদ্ধতি এ নয় যে, বিত্তশালী মুসলমানরা নিজেরা নিজেদের যাকাতের অর্থ নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করবে। আদায় ও বণ্টন করার (تؤخذ وترد) অর্থই হলো এই যে, সেখানে অবশ্যি এমন একটি হাত থাকতে হবে যে আদায় করা ও বণ্টন করার দায়িত্ব সম্পাদন করবে। বলাবাহুল্য এ হাত একমাত্র সরকারেরই হতে পারে। যেমন কুরআন মজীদের বাক্য والعاملين عليها থেকে জানা যায় এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও খেলাফতে রাশেদার আমলের কার্যাবলী থেকে প্রমাণ হয়। মুসলমানদের যাকাত সরকারের হাতে সোপর্দ করা যে কত অপরিহার্য তা এ থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলে যখন কিছু লোক খলীফার হাতে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফা হযরত আবুবকর তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বলেনঃ

وَاللّٰهِ لَوْمَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ -

"আল্লাহর কসম! যদি তারা উট বাঁধার একটি দড়িও—যা তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রদান করতো—আমাকে না দেয়, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"–মুসলিম

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

নিজের কামরার মধ্যে পড়তেন। তাঁর এ বাণী ও কর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুস্পষ্ট কারণ হলো এই যে, গৃহের নির্জনতায় পূর্ণ একাগ্রচিত্ততার উদ্ভব হয়। তাই নামাযের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য গৃহাভ্যন্তরই উপযুক্ত স্থান। এভাবে ফরয নামাযসমূহ জামাআতের সাথে আদায় করার ফলে হৃদয়ে একাগ্রতার যে ক্ষতি হয় এ নফল নামাযগুলো তা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

নামাযের উপকারিতার ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, সে ভিতর-বাহির উভয়কেই পুরোপুরি লাভবান করে। সে একদিকে ভিতরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিতির মাহাত্ম্য দান করে এবং অন্যদিকে বাহিরকে সমাজবদ্ধতার অনুষ্ঠানমূহ দ্বারা সুশোভিত এবং শৃংখলা ও ঐক্যের শক্তিমণ্ডিত করে। আজকের মুসলিম সমাজ তার এ দান থেকে যতই বেখবর হোক না কেন, এমনও এক যামানা ছিল যখন ইসলামের শত্রুরাও এ থেকে বেখবর ছিল না। ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ "প্রখ্যাত ইরানী সিপাহসালার রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের নামাযের জন্য একত্রিত হতে দেখে বলে ওঠে, 'ওমর (রা) আমার কলিজা খেয়ে ফেলেছে, সে কুকুরদেরকে আদব-শৃংখলা শেখাচ্ছে'।–মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা–১৩

www.pathagar.com

যাকাত সম্পর্কে শরীআতের এ দুটি নির্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার অনুভব হবে যে, শরীআত ইবাদাতকেও সমাজ ও সমষ্টির উৎসে পরিণত করেছে। একদিকে অন্যকে সাহায্য ও সহানুভূতি এর উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি এমন একটি কাজ ও কাজের প্রেরণা যা সৎ ও সুন্দর সমাজ সমষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিপ্রস্তর। অন্যদিকে এ ইবাদাত অনুষ্ঠানের পদ্ধতিকে সরকারী ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আর সরকারী ব্যবস্থাই সমাজ ও সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ রূপ। আবার এ বিষয়টি যাকাতের আসল উদ্দেশ্য ও তার মৌলিক লক্ষের অনুপযোগী হতে পারে এবং তার উপযোগী হতেই পারে না, এ সত্ত্বেও শরীআত এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যাকাতের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো অন্তরের পরিশুদ্ধি تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ "তার সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩ যাতে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে। إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ "মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।"–সূরা আল লাইল ঃ ২০। বলাবাহুল্য এ উদ্দেশ্য তখন সম্পাদিত হতে পারে যখন স্বহস্তে অভাবীদেরকে যাকাত দেয়া হবে এবং এমনভাবে দেয়া হবে যাতে দাতার বাম হাতও না জানতে পারে যে, তার ডান হাত কি দিল এবং কিভাবে দিলো ? অন্য কথায় প্রকাশ্যভাবে, তাও আবার সরকারের ক্ষমতা, শৃংখলা ও নিয়ম-কানুনের আওতায়। যাকাত আদায় করার সময় আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণায় প্রভাবান্বিত হবার আশংকা অনস্বীকার্য সত্য। এর অর্থ তাহলে এ দাঁড়ায় যে, ইসলাম নামাযের ন্যায় যাকাতের মাধ্যমেও নিজের সমাজপ্রিয়তার প্রদর্শনী করেছে। কেননা ইবাদাতের আসল ও মৌলিক উদ্দেশ্য প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা ও আশংকার ওপর সে সামগ্রিক অনুষ্ঠান ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করেছে।

৩. রোযা ঃ তৃতীয় ইবাদাত হলো রোযা। এটি একটি নেতিবাচক ইবাদাত। অর্থাৎ এতে নামায, যাকাত বা হজ্জের ন্যায় এমন কোনো অনুষ্ঠান করা হয় না, যা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে বরং কতিপয় বিশেষ কাজ পরিহার করা হয়। বলাবাহুল্য, যে কাজের ধরন নেতিবাচক হয়, তার গায়ে সমষ্টিবাদের জামা পরিয়ে দেয়া কঠিন এবং তাকে সামষ্টিক চেতনায় স্থায়িত্ব ও উন্নতির মাধ্যমে পরিণত করাও কঠিনতর হয়। কিন্তু রোযা সম্পর্কে শরীআত যেসব নির্দেশ দিয়েছে তা থেকে প্রকাশ হয় যে, এ নেতিবাচক ইবাদাতটিকেও সমষ্টিবাদের 'পথপ্রদর্শক' ও 'শিক্ষকে' পরিণত করা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সমস্ত মুসলমানকে একটি নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

মাসে রোযা রাখতে হবে, প্রত্যেক দিন প্রায় একই সময়ে সাহরী খেতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবাইকে রোযা ভাঙতে হবে। এ নির্দেশাবলীর প্রেক্ষিতে এ ইবাদাতটি থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলো এই যে, সমগ্র ইসলামী সমাজ পূর্ণ একটি মাস একটি সুশৃঙ্খল শিক্ষা শিবিরের রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্রই বন্দেগীর একই পরিবেশ সৃষ্টি, প্রত্যেকটি লোকের চেহারা থেকে সংযম ও কৃচ্ছ্রতার একই আভা পরিস্ফুট হয়। যে সমাজে অনবরত এক মাসকাল এমনই অস্বাভাবিক ধরনের একই পর্যায়ের মানসিক পরিবেশ এবং একই প্রকার বাহ্যিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং যে সমাজ পরিপূর্ণভাবে একটি শিক্ষা শিবিরের রূপ লাভ করে, তার ব্যক্তিবর্গের মনে কি বারবার এ ধারণা সৃষ্টি হবে না যে, আমরা সবাই একই জীবন সাধনার পতাকাবাহী এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেনানী ?

এ ধরনের একটি নেতিবাচক ইবাদাতকে সমষ্টিবাদের নিশানবরদারে পরিণত করা সমাজ ও সমষ্টিপ্রিয়তার পূর্ণতার প্রমাণ।

৪. হজ্জ ঃ চতুর্থ ইবাদাত হলো হজ্জ। হজ্জের উদ্দেশ্য হলো এক আল্লাহর উপাসক ও সত্য রবের প্রাণ উৎসর্গকারী বান্দাকে তাওহীদের সেই কেন্দ্রীয় গৃহে উপস্থিত করা যেখানে চতুর্দিকে সত্যিকার আল্লাহপরস্তির প্রতীকসমূহ প্রাণ উৎসর্গ করার শিক্ষাদান করছে, যে গৃহ তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঈমান ও ইলমের মূর্তপ্রতীক। তাওহীদের এ কেন্দ্রীয় গৃহে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য হলো তার চর্মচক্ষু ও অন্তরের চক্ষু উভয়কেই প্রেমের এ কুরবান গৃহকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করানো, যাতে করে সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাস্তব ব্যাখ্যা জানতে পারে, অতপর আল্লাহপরস্তির সাচ্চা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বন্দেগীর কর্মক্ষেত্রে এক নয়া জে াশের সাথে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়।

এ ইবাদাতের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হলো আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকা। এখানে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিভিন্ন বংশ, গোত্র, জাতি, ভাষা ও বর্ণের লাখ লাখ মুসলমান একত্রিত হয়। তাদের সবার একজন 'আমীরে হজ্জ' থাকেন। আমীর সমগ্র জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ঈমানের তাৎপর্য, ইসলামের দাবী ও বন্দেগীর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন শিক্ষা দান করেন। যে ব্যক্তি এ সমাবেশে উপস্থিত হতে পারে না তার হজ্জ আদায় হবে না। হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোকে সে যতই গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করুক না কেন তাতে কোনো প্রকার পার্থক্য সূচিত হবে না।

www.pathagar.com

এ থেকে বুঝা গেল যে, হজ্জকেও সমাজবদ্ধতার ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছে। তাকে সমষ্টির চেতনার একটি বিরাট মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে অন্যান্য ইবাদাতের ন্যায় এখানেও দেখা যাবে যে, হজ্জের যে আসল উদ্দেশ্য তা সকল প্রকার সমষ্টির প্রয়োজন মুক্ত। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমষ্টি তার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে। কেননা নির্জনতার শান্তি ও একাগ্রতা কোনো প্রকার সমষ্টির ভীড়ের মোকাবিলায় মানুষকে কা'বাগৃহ ও তার চতুষ্পার্শ্বের আল্লাহর প্রতীকসমূহের মাধ্যমে ঈমানকে তাজা ও শক্তিশালী করার অধিকতর সুযোগ দান করতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীআত বলে যে. সমষ্টি ছাড়া হজ্জ সম্পাদিত হতেই পারে না। অর্থাৎ অন্য কথায় তার বক্তব্য হলো এই যে, সমষ্টির দীনী গুরুত্ব প্রকাশ করার ও তাকে অনুধাবন করাবার ব্যাপারে অন্যান্য ইবাদাতগুলো থেকে সে কোনো প্রকারে পেছনে নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে তাদের চেয়ে অগ্রবর্তী।

ইসলাম তার ইবাদাতসমূহে যেসব সামষ্টিক অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছে তার প্রয়োজনীয় অংশ বর্ণনা করা হলো এবং এখানে ঐ অনুষ্ঠানসমূহের যথাযথ গুরুত্বও বর্ণিত হলো। অতপর একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, সমষ্টিবাদের প্রাণবস্তুকে যেভাবে এ ইবাদাতসমূহের গভীরে প্রবেশ করানো হয়েছে, তাতে তা কার্যত গভীরতার শেষ সীমান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

সমষ্টিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষাসমূহের বিভিন্ন বিভাগের যে বিস্তারিত পর্যালোচনা এখানে করা হলো তারপর একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলামে সমষ্টিবাদকে যে উন্নত মর্যাদা দান করা হয়েছে তার নজীর অন্য ধর্মে তো দূরের কথা, অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থায়ও পাওয়া যেতে পারে না।

❐

www.pathagar.com

গুরুত্বের কারণ

অসামাজিক জীবনের ভয়াবহ পরিণাম

মাছ যেমন পানির প্রত্যাশা করে, ইসলামও ঠিক তেমনি সমষ্টির প্রত্যাশী। আগের আলোচনা থেকে একথাই প্রতিভাত হয়েছে। চিন্তা করা উচিত, এমন কেন ? ইসলাম সমষ্টিকে এমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়েছে কি কারণে ? সে তার অনুসারীদেরকে এমন সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাপন করার জন্য এত চাপ দেয় কেন ? সে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে আবশ্যক গণ্য করে কেন ? সে এ ব্যবস্থার প্রধান পরিচালকের আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং তাঁর নাফরমানিকে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি আখ্যা দেয় কেন ? সে 'আল-জামাআত' থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে অবস্থানকারীর গলা থেকে নিজের আনুগত্যের শৃঙ্খল নামিয়ে নেয় কেন ? এবং জাতীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারীর ওপর থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে কেন ? সে খেলাফতের বাইয়াত থেকে বঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলে কেন ?—এ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে সাধারণ মানবিক চিন্তা কেবলমাত্র 'কি' এর জবাবে নিশ্চিত হয় না বরং নিশ্চিন্ত তখনই হয় যখন সে এও জানতে পারে যে, 'এমন কেন ?' তাই এ সত্য যদিও দ্ব্যর্থহীন ও প্রোজ্জ্বল কিন্তু মনোজগতে যথাযথ মর্যাদা লাভ করার জন্য এর কারণসমূহ বর্ণনারও জোর দাবী জানায়।

এ প্রসঙ্গে এতটুকু অবশ্যি দ্ব্যর্থহীন ও অপরিহার্য মনে করা উচিত যে, ইসলামের উদ্দেশ্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমষ্টিবাদ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং দীন ও ঈমানের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করে। অন্যথায় ইসলাম তাকে এমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব দান করতো না। তাই চিন্তা ও জানার বিষয় হলো শুধু এই যে, ইসলামের উদ্দেশ্য সম্পাদনের ব্যাপারে সে কিভাবে অংশগ্রহণ করে এবং দীন ও ঈমানের স্বার্থ রক্ষায় কি কার্য সম্পাদন করে ? এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ইসলামের উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাই।

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ۔

"জামাআতকে আঁকড়ে ধরো, কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগলটিকে খেয়ে ফেলে যে দলছাড়া হয়ে দূরে চলে যায়।"–আবু দাউদ

www.pathagar.com

اَلشَّيْطَانُ ذِئْبُ الانْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاخُذُ الشَّاذَّةَ وَالقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةَ -

"ছাগলের জন্য যেমন নেকড়ে বাঘ তেমনি শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ। এ নেকড়ে বাঘ সেই ছাগলটিকে ধরে যে দলছাড়া হয় ও দূরে চলে যায় অথবা পৃথক হয়ে কোনো দিকে গিয়ে থাকে।"

–মুসনাদে আহমদ

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ اَبْعَدَ -

"আল-জামাআতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দল ভাঙার নিকটবর্তীও হয়ো না। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির সহযোগী হয় আর দু ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যায়।"–তিরমিযী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ফিতান

অর্থাৎ সমষ্টির সাথে নিজেকে এ জন্য জড়িয়ে রাখতে হবে যে, একমাত্র এভাবেই ঈমানী যিন্দেগীর যথাযথ সংরক্ষণ সম্ভব। এ সামষ্টিকতার অনুপস্থিতিতে মুসলমানের দীন ও ঈমানের নিরাপত্তা অসম্ভব। কেননা সমষ্টি থেকে পৃথক হলেই সে শয়তানের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় চলে যায়। সেখানে শয়তান তাকে অতি সহজেই শিকার করতে পারে। বিপরীত পক্ষে জাতীয় সমাজ এমন একটি লৌহ নির্মিত আশ্রয়স্থল, যার মধ্যে প্রবেশ করে কোনো ঈমানদারকে শিকার করা চাট্টিখানি কথা নয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী থেকে যে জবাব আমরা পেয়েছি, তা যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু আলোচ্য প্রশ্নের সমাধানের জন্য যথেষ্ট। কেননা তাঁর এ সংক্ষিপ্ত জবাবের বিস্তারিত বিবরণ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। বরং তার ব্যাখ্যার জন্য ইসলামের সমগ্র দর্শন, শরীআতের সমগ্র ব্যবস্থা ও জাতির সমগ্র ইতিহাস রয়েছে। এ দর্শন, ব্যবস্থা ও ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যাবে যে, ইসলাম যে সমাজ চায়, তা যদি অস্তিত্ব লাভ না করে, তাহলে মুসলমানের দীন ও ঈমান এক, দুই নয়, বরং তিন দিক থেকে কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

এক ঃ পরিবেশের বাতিলপ্রিয়তা

প্রথম কথা হলো এই যে, ইসলামের সামাজিক আদর্শ বঞ্চিত পরিবেশ ভ্রান্তচিন্তা, কর্ম ও মূল্যবোধের জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক উপযোগী এবং সৎ চিন্তা, কর্ম ও মূল্যবোধের জন্য বহুলাংশে অনুপযোগী হয়। এ

www.pathagar.com

কারণে সম্ভাব্য পরিসরেও আল্লাহভীতি ও ধর্মানুবর্তিতার পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হয় না। এটি একটি জাজ্জল্যমান সত্য। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সামান্য চিন্তা করলেও একথা উপলব্ধি করা যায় যে, যেখানে ইসলামের প্রত্যাশিত সামাজিক আদর্শের অস্তিত্ব থাকবে না, সেখানে তার প্রত্যাশিত চিন্তা ও কর্ম এবং নৈতিকবৃত্তি ও মূল্যবোধের জন্য উপযোগী পরিবেশও থাকবে না। ইসলামী সমাজ দর্শনের অর্থই বা কি ? তার অর্থ আল্লাহর রশি দিয়ে মযবুত করে বাঁধা একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ? সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। তার প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু নিজে সৎ হওয়াকে যথেষ্ট মনে করে না বরং অন্যকেও সৎ ব্যক্তিতে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টারত থাকা নিজের দীনী কর্তব্য মনে করে। তার সাধারণ পরিবেশে ভ্রান্তি ও অসৎ বৃত্তির অস্তিত্বই থাকে না। সেখানে আল্লাহভীতি হয় মর্যাদার মানদণ্ড এবং সৎকাজে পরস্পরের থেকে অগ্রবর্তী হওয়া ও পরস্পরের সাহায্য করা হয় সে সমাজের আসল বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য এমন একটি সমাজে কোনো অনুভূতিশীল মুসলমানের জন্য সৎ ও সত্যানুসারী হওয়া সহজ এবং অসৎ হওয়া কঠিন। বলা যায় যে, তার জন্য মুসলমান হয়ে থাকা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে চলার ন্যায়। এমনকি কোনো তৃতীয় পর্যায়ের ঈমানী ও নৈতিক অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিও অসৎকর্ম থেকে সামগ্রিকভাবে সংরক্ষিত থাকবে। কেননা এ পরিবেশ তাকে অনবরত সততার দিকে আকৃষ্ট করবে এবং অসৎ বৃত্তির প্রতি তার মনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে থাকবে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে তার চিন্তা ও কর্মের ওপর আল্লাহভীতি এবং সৎ ও সততাপ্রিয়তা প্রভাব বিস্তার করবে। বিপরীত দিকে ইসলামের সামাজিক আদর্শের অনুপস্থিতির অর্থ হলো এমন একটি পরিবেশ যেখানে মুসলমান থাকবে কিন্তু তাদের কোনো সমাজ থাকবে না। আর যদিও বা সমাজ থাকে তাহলে তা এমন সমাজ হবে যার কোনো অটুট বন্ধন বা সামষ্টিক সংগঠন থাকবে না। আবার বন্ধন ও সামষ্টিক সংগঠন থাকলেও তা কুরআন ভিত্তিক বা ইসলামী হবে না। নিঃসন্দেহে এ পরিবেশ নির্ভুল অর্থে কখনো সৎপ্রিয় ও অসৎ বিরোধী হবে না। এখানে ইসলামী মূল্যমান-সমূহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। এখানে চতুর্দিকে বাতিল প্রিয়তার পরিবেশ বিরাজ করবে। এমন পরিবেশে একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য সৎ হওয়া কঠিন এবং অসৎ হওয়া সহজ হবে। তাই এখানে মুসলমান হিসেবে বাস করা কোনো সমতল ভূমিতে হেঁটে চলার সমার্থ

www.pathagar.com

নয় বরং খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে ওঠার নামান্তর। এর ফল কেবল এ হতে পারে যে, মুসলমান সামগ্রিকভাবে আল্লাহভীতি ও কল্যাণপ্রিয়তার গুণাবলী থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে।

দুই ঃ দীন অনুসৃতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য অপূর্ণতা

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, এমন পরিবেশ ও সমাজে মুসলমান কার্যত একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত ইসলাম থেকে অবশ্যি সম্পর্কহীন হয়ে থাকে। ইসলাম কি এবং মুসলমানকে এ পৃথিবীতে কেন পাঠানো হয়েছে, একথা যে জানে তার দৃষ্টি থেকে এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না। দীনের সমগ্র ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, ইসলামী সমাজের অনুপস্থিতিতে মুসলমান কার্যত নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন দিক দিয়ে ইসলাম থেকে সম্পর্কহারা হয়ে পড়ে।

[ক] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এই যে, সে আল্লাহর অধিকারসমূহ পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। অন্যকথায় সে এ বন্দেগীর বহু গুরুত্বপূর্ণ দাবী পূরণ করার ক্ষমতা রাখে না। তার দীনের সাক্ষ ও তাকে প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তার জন্য আর কি হতে পারে! এ কর্তব্য সম্পাদনই মুসলমানের চরম লক্ষ। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে আর কি হতে পারে! হাদীসে এটিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাজ এবং এর আকাঙ্খাশূন্য হৃদয়কে মুনাফিকের হৃদয় গণ্য করা হয়েছে। সামষ্টিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে কি এ কর্তব্য সম্পাদন করার কোনো কার্যকরী পন্থা সম্ভবপর ? কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। এগুলো বাদ দিয়ে যদি শুধু দীনের সেই সমস্ত নির্দেশকে নেয়া যায়, যেগুলোর ইবাদাত ও আল্লাহর অধিকার হবার ব্যাপারে শাব্দিক দিক দিয়েও দ্বিমত থাকতে পারে না যেমন নামায, যাকাত, হজ্জ। তাহলে দেখা যাবে যে, সমাজ ও সামষ্টিক পরিবেশ ছাড়া আল্লাহ ও রাসূল সেগুলোকে যেভাবে দেখতে চান সেভাবে আদায় হতে পারে না। এ সুস্পষ্ট সত্যের উপস্থিতিতে একথা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, ইসলাম যে সামাজিক আদর্শের প্রত্যাশা করে তা থাকবে না অথচ আল্লাহর অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে ?

[খ] বান্দার অধিকারেরও একই অবস্থা। গরীব-দুঃখীর সাহায্য, অসহায়ের সহায়তা, মযলুমের সাহায্য, রোগীর সেবা, জানাযায় অংশগ্রহণ তথা সাধারণভাবে কোনো মুসলমানের ওপর আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের যেসব অধিকার থাকে সমাজ জীবন ছাড়া সেগুলো আদায় হবার পূর্ণ সুযোগ

www.pathagar.com

কোনোক্রমেই পাওয়া যাবে না। এ সামাজিক আদর্শ থেকে তার জীবন যতদূরে অবস্থান করবে এ সুযোগের হার ততই কম হবে। এমন কি যদি এ দূরত্ব পূর্ণ পৃথকীকরণ ও একাকীত্বের সীমান্তে পৌঁছে যায়, তাহলে আদতে এ সুযোগের অস্তিত্বই নির্মূল হয়ে যাবে।

[গ] চারিত্রিক বিষয়াবলীর অবস্থাও এ থেকে ভিন্নতর নয়। ইসলামে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব কোনো অপ্রকাশিত বিষয় নয়। একদিক দিয়ে বিচার করলে যেন এটিই ইসলামের সারকথা বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ 'সৎচারিত্রিক বৃত্তিকে পূর্ণতা দানের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে ঃ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق কিন্তু এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অসামাজিক জীবনে আত্মপ্রকাশের পথ পায় না। এমনকি যেখানে অসামাজিক জীবন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ নির্জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানে সততা, আমানতদারী, পবিত্রতা, লজ্জা, ওয়াদাপূরণ, দয়া, মমতা, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ, মানবিক, ইসলামী ও ঈমানী গুণাবলী ও চারিত্রিক আদর্শ কার্যত স্থবির চিন্তায় পরিণত হয়। কেননা এগুলোর সম্পর্ক মূলত মানুষের পারস্পরিক সংযোগ ও ব্যবহারের সাথে। পরিচিত অর্থে চরিত্র বলতে একজন মানুষ অন্য মানুষের সাথে বা একটি দল অন্য দলের সাথে যে ব্যবহার করে তাকেই বুঝায়। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো স্থানে গিয়ে বসবাস করে যেখানে অন্য কোনো লোকের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না, তাহলে দীনের এ দাবীগুলোকে সে কেমন করে পূর্ণ করবে ? অনুরূপভাবে যেখানে কোনো সংগঠিত সমাজ ও তার পূর্ণ সামষ্টিক শৃঙ্খলার অস্তিত্ব থাকবে না সেখানে কোন্ বস্তু মুসলমানকে ইসলামের সামগ্রিক ও আন্তর্জাতিক চারিত্রিক আদর্শের বিকাশে সাহায্য করবে ?

[ঘ] মুসলমানের সাধারণ তমদ্দুনিক ও সমাজ জীবনের ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত গভীর ও অস্বাভাবিক বিরোধী প্রভাব পড়ে। কেননা এ অবস্থায় তার জীবনের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ইসলাম বিদায় গ্রহণ করে এবং এ সাথে সেখানে ইসলামের স্থলে কুফরের আগমন হয়। এটি একটি অতি পরিচিত ও সুস্পষ্ট সত্য। বলাবাহুল্য মুসলমান যদিও কোনো গৃহাভ্যন্তরে নির্জনবাসী নয় বরং লোকালয় ও লোকবসতির মধ্যেই অবস্থান করে তাহলে এ অবস্থায় ইসলামের প্রত্যাশিত সামাজিক আদর্শের অনুপস্থিতির অর্থ এ দাঁড়ায় যে, নিশ্চয়ই সে কোনো অনৈসলামী ব্যবস্থার আওতায় জীবনযাপন করছে এবং কোনো অনৈসলামী ব্যবস্থার আওতায় জীবনযাপনের অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, মুসলমানের জীবন-ধারা

www.pathagar.com

কমপক্ষে বড় বড় সামাজিক বিষয়ে—অবশ্যি অনৈসলামী পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বরং একথা বলাও সত্য বিরোধী হবে না যে, তার পার্সোনাল ল'-এর মর্যাদাও পুরোপুরি অব্যাহত থাকবে না।

এসব দিক দিয়েও এ পর্যায়ে ইসলাম থেকে কার্যত সম্পর্কচ্ছেদ কোনো সাধারণ কথা হতে পারে না। অথবা এ পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য "একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত ইসলাম থেকে সম্পর্কচ্ছেদ" এবং "দীন অনুসৃতির ক্ষেত্রে বিরাট অপূর্ণতা" শব্দগুলোকে বড় কড়া শব্দ বলতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (স) নারীদেরকে ناقصات الدين (ক্ষতিগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ দীনদার) আখ্যা দিয়েছেন এবং এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "ঋতুস্রাব শুরু হলে তারা নামায পড়তে ও রোযা রাখতে পারে না"– বুখারী, কিতাবুল হায়েয। اَذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَالِكَ نُقْصَانُ دِيْنِهَا চিন্তা করুন, প্রত্যেক মাসে কয়েক দিন যদি মেয়েরা নামায পড়তে না পারে, রোযা রাখতে না পারে এবং একে তাদের দীনের অসম্পূর্ণতার প্রমাণ গণ্য করা হয়, তাহলে মুসলমানরা যেখানে সারা জীবন ইসলামের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান নির্দেশকে কার্যকরী করতে পারে না সেখানে তাদের দীনী অবস্থাকে কোন্ পর্যায়ে গণ্য করা যায় ? বিশেষ করে যেখানে মেয়েদের এ অবস্থা তাদের প্রকৃতিগত, জন্মগত এবং পুরোপুরি বাধ্যতামূলক অবস্থায় সৃষ্ট, যেখানে এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার পর নিজেদের প্রচেষ্টা খতম করে দেয়া সম্পূর্ণ তাদের ক্ষমতার বাইরে এবং এজন্যই এ ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো প্রকার দায়িত্ব বর্তায় না। অথচ অন্যদিকে সমাজ জীবন থেকে পৃথক বা বঞ্চিত মুসলমানের অবস্থা প্রকৃতিগত ও জন্মগত তো নয়ই, বাধ্যতামূলকও নয়। বরং অনেক সময় এ অবস্থা সৃষ্টি করা বা তাকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়। এ পরিস্থিতিতে তার দীনকে অসম্পূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত নয়—একথা বলা কি সম্ভব ? এবং অসামাজিক ও সংগঠন শূন্য জীবন যাপন করার জন্য দীনের যে সমস্ত নির্দেশকে সে কার্যকরী করতে পারে না, সেগুলোর নির্ধারিত সীমানার মধ্যে তাকে দীন থেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করা কি ভুল হবে ? ন্যায়নীতির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো এই যে, তার দীনকে শুধু অসম্পূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্তই নয় বরং অধিকতর অসম্পূর্ণ ও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত গণ্য করা উচিত এবং 'একটি নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত দীন থেকে সম্পর্কহীন নয়' বরং তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্যও মনে করা উচিত।

www.pathagar.com

তিন ঃ দীনী অনুভূতির ধারাবাহিক অবনতি

অসামাজিক জীবনের তৃতীয় বিপদ হলো এই যে, দীনী অনুভূতি ও ঈমানী গায়রাতের ওপর বাতিল অনবরত আঘাত হানতে থাকে। এমন কি অবশেষে তাদেরকে সংজ্ঞাহীন করে দেয়। ইসলামী সমাজ-জীবন থেকে বঞ্চিত মুসলমানের ওপর বাতিল কর্তৃত্ব লাভের এ সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। কারণ, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রত্যাশিত সামাজিক আদর্শ ও সামষ্টিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে সাধারণত এ অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, মুসলমানের জীবন একটি অনৈসলামী ব্যবস্থার অধীনে অতিবাহিত হচ্ছে। অর্থাৎ এমন একটি অনৈসলামী ব্যবস্থার অধীনে অতিবাহিত হচ্ছে, যেখানে জীবনের সাধারণ সামষ্টিক কার্যাবলী কুফরী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যেখানে প্রধান কর্তৃত্বশালী ও আসল আইন প্রণেতা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্য কেউ হয়, যেখানে মানবিক প্রতিনিধিত্বের ধারণা মূলগতভাবে একটি আইন বিরোধী ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে নৈতিকতার সামগ্রিক মূল্যমান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নয় বরং অন্য কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়, যেখানে ব্যাপকতর সামাজিক বিষয়াবলীতে ইসলামকে মুসলমানদের নেতৃত্ব করার কোনো অধিকার দেয়া হয় না, যেখানে সৎ ও অসৎকর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরীআতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হয় না—উপরন্তু যেখানে অনেক সৎকর্মকে অসৎকর্মে ও অনেক অসৎকর্মকে সৎকর্মে রূপান্তরিত করা হয়েছে—সেখানে মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি ন্যায় নীতি, ইনসাফ ও সৎকর্মে সহযোগিতা করার ইসলামী নীতির পরিবর্তে কোনো জাতি, বংশ, দেশ, শ্রেণী অথবা কোনো 'ইজম'-এর বস্তুবাদী স্বার্থের ওপর স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে আদালতসমূহ শরীআতের আইন অনুযায়ী ফায়সালা করতে মোটেই বাধ্য নয়। এমন কি যেখানে মুসলমান নিজের ব্যক্তিগত বিষয়েও ইসলামী নির্দেশ ও সংবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। চিন্তা করুন, এহেন ব্যবস্থায় ও পরিবেশে একজন মুসলমানের মানসিক অবস্থা কেমন হবে ? প্রথম দিকে কেমন থাকবে আর পরবর্তী পর্যায়ে কোথায় গিয়ে পৌছবে ? নিসন্দেহে বলা যায়, এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ ছটফট করতে থাকবে, তার দম আটকে যেতে থাকবে, সে নিজেকে আবর্জনা স্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে পাবে। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, বড় বড় সূক্ষ্ম রুচিশীল ব্যক্তিরাও যদি আবর্জনা পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় কুঠরীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাহলে মাত্র একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত

www.pathagar.com

তাদের মনে অস্থিরতা, ঘৃণা ও কষ্টের ভাব বিরাজমান থাকবে। অতপর যতই সময় অতিক্রান্ত হবে ততই তাদের ঘৃণা এবং অস্থিরতাও কমতে থাকবে। এমন কি অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন তাদের ঘ্রাণশক্তিতে সেখানকার দুর্গন্ধ সহ্য হয়ে যাবে। তখন তারা কেবলমাত্র আদর্শিক পরিসরে এ আবর্জনা ও দুর্গন্ধকে ঘৃণ্য বলে গণ্য করবে আর কার্যত একে ঘৃণা করবে না। মানুষের মনোজগত সম্পর্কে যিনি কিছুটা অধ্যয়ন করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। এটি মনোবিজ্ঞানের একটি সর্বজন স্বীকৃত নীতি। বলাবাহুল্য দীনের ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানের এ নীতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। আপনি ইচ্ছা করলে লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে কয়েক ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম হিসেবে পেশ করতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও একথাই প্রমাণ করে যে, শতকরা নিরানব্বই জনের চেয়েও বেশি লোকের ওপর পুরোপুরি এ নীতি কার্যকরী হবে। অর্থাৎ জাতি যখন তার সামাজিক আদর্শ হারিয়ে ফেলবে অথবা তার বাঁধন ঢিলে করে কোনো অনৈসলামী ব্যবস্থাকে নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে তখন ঈমানদাররা মনে করবে যেন তাদের বিছানা অগ্নিস্ফুলিংগে পরিণত হয়েছে, যেন তাদের সামনে, পেছনে, ডাইনে, বামে সকল দিকে গ্যাস বোমা ফোটানো হয়েছে এবং তাতে তাদের বিছানা ও শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ভীত-শংকিত হয়ে তারা দূরে পালিয়ে যাবার জন্য নিজের কম্পিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। অস্থির হয়ে হাত-পা ছুড়াছুড়ি করবে। কিন্তু জীবনের সামগ্রিক বিষয়াবলীর ওপর যে ব্যবস্থা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে এ মানসিক বিদ্রোহে প্রভাবিত হয়ে নিজের কর্তৃত্বের হস্ত গুটিয়ে নেবে না। বরং সে পূর্ণ শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা সহকারে রীতিমত নিজের কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবে। জাতি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সে তার ওপর নিজের অমুসলিম প্রকৃতি ও রাজনৈতিক দাবী মোতাবেক চিন্তা, আদর্শ, মূল্যমান, নির্দেশাবলী ও আইন-কানুনের মাধ্যমে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবে। অবশেষে চোখ ধীরে ধীরে এ অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আবেগ-চাঞ্চল্য ও মানসিক বিদ্রোহ পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে নিস্তেজ হয়ে যাবে। অস্থিরতা নিছক দুঃখ অনুভূতির পর্যায়ে এসে পৌঁছবে এবং বিদ্রোহের আগুন আক্ষেপের ছাইতে পরিণত হবে। অতপর এ যুগেরও অবসান হবে এবং তারপর দীনী আত্মর্যাদাবোধ থেকে হৃদয় শূন্য হতে থাকবে। মন ও মেজাজ অনৈসলামী বিষয়াবলীর সাথে খাপ খাইয়ে চলতে থাকবে। মানসিক ও আবেগের সংগ্রাম সন্ধি ও কোমল ব্যবহারে পরিবর্তিত হবে। অনৈসলামের সাথে মুসলমানের কোনো সক্রিয়

www.pathagar.com

বিরোধিতা থাকবে না। এমনি করে চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্যায়ও উপস্থিত হবে। তখন যে অনৈসলাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিল তাই উৎকৃষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যবস্থা ও কর্তৃত্ব মুসলমানের দীনকে কর্তৃত্বচ্যুত করেছে অথবা কমপক্ষে তাকে বন্দীশালায় শৃংখলিত করে রেখেছে, মুসলমান তাকে সেলামী দেবে, তার দরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভের জন্য ধরণা দেবে, তার চাকুরী করে গর্ব অনুভব করবে, তার তল্পীবাহক হবার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। সে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অনৈসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মৌখিক অসন্তোষও প্রকাশ করবে না। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর নির্দেশ ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী মানুষকে এ পৃথিবীর ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ এখানকার মূল ও শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং তিনিই আসল আইন প্রণেতা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ এ জীবন বিধান অনুসৃতির উপর নির্ভরশীল।—একথাগুলো এবং এ ধরনের আরো অনেক উচ্চাংগের কথা ধর্মীয় সভা সমিতি মাহফিলে চটকদার বক্তৃতা হিসেবে মাহফিল গুলযার করতে থাকবে, কিন্তু দুনিয়ার বিশাল কর্মক্ষেত্রে দেশের অনৈসলামী ও কাফের কর্তৃত্ব পরিচালিত ব্যবস্থার রেল লাইনের ওপর দিয়ে জাতি তার জীবনের গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকবে। জাতির বর্তমান অবস্থা এ সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত। এরপর অন্য কোনো প্রকার যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজনই বা কি! ঘটনাবলীর এ সুস্পষ্ট সাক্ষকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিন্তা করুন, বাতিল কর্তৃত্ব ও অনৈসলামী ব্যবস্থা ঈমানী আত্মমর্যাদা ও দীনী অনুভূতির ওপর কোন্ ধরনের আঘাত হানতে পারে এবং এ আঘাত হানতে হানতে তাকে কেমন নির্জীবতা ও মৃত্যুর হীমশীতলতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে!

ইসলামের সামাজিক আদর্শ বঞ্চিত জীবন যে মুসলমানের দীন ও ঈমানের ওপর এত বড় আঘাত হানে এবং তাকে এ বিরাট বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করে সে এরপরও কতদিন এবং কতটুকু পরিমাণ সাচ্চা মুসলমান থাকতে পারে ? তাই একথা স্বীকার করতে হবে যে, শয়তানের হাজার প্রচেষ্টার তুলনায় মুসলমানকে সমাজ জীবন থেকে বঞ্চিত করার এ একটি মাত্র প্রচেষ্টা অনেক বেশি শক্তিশালী। এক একজন মুসলমানকে পৃথক পৃথকভাবে শিকার করতে চাইলে তাকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পৃথক গর্ত খুঁড়তে হবে, কিন্তু যদি সে নৈরাজ্য ও অনৈসলামী জীবনের গর্ত খুঁড়ে, তাহলে এ একটি গর্ত বিপুলসংখ্যক মুসলমানের জন্য যথেষ্ট হবে। তাই জামাআত থেকে পৃথক অবস্থানকারী অথবা জামাআত বঞ্চিতদেরকে যদি

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (স) শয়তানের সহজ শিকার আখ্যা দিয়ে থাকেন, তাহলে এ পরিস্থিতির চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা আর হতেই পারে না।

সমাজ জীবনের অমূল্য অবদান

অসামাজিক জীবন দীন ও ঈমানের জন্য এসব বিরাট বিরাট বিপদ সৃষ্টি করে এবং মুসলমানকে শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত করে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীবন তাদেরকে কিসের পয়গাম শোনায় ? একথা জানার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী শুনুন ঃ يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ "জামাআতের ওপর আল্লাহর হস্ত (সাহায্য) থাকে।" অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবনেই মুসলমান সত্যিকারভাবে আল্লাহর দান ও সাহায্য লাভ করার অধিকারী হয়।

এখানেও যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এমনটি কেন ? তাহলে এটি একটি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন হবে। কেননা আমরা ইতিপূর্বে যা জানতে পেরেছি তাই যদি অসামাজিক জীবনের বাস্তব পরিণতি হয়ে থাকে, তাহলে এর সুস্পষ্ট অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সামাজিক জীবনের ফলাফল হবে ঠিক এর বিপরীতধর্মী। যে সমাজ ইসলামের প্রত্যাশিত সামাজিক আদর্শ শূন্য থাকে সে যদি ভ্রান্ত চিন্তা ও কর্মের বিকাশ সাধন করে এবং সৎ চিন্তা ও কর্মকে বিশুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টারত থাকে, যার ফলে মুসলমানের জন্য সততা ও আল্লাহভীরুতার পথ কঠিনতর হয়ে পড়ে, তাহলে ইসলামের সামাজিক আদর্শে পরিপুষ্ট সমাজ অবশ্যি একটি ভিন্নতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, সৎ চিন্তা ও কর্মের বিকাশ সাধন করবে, বাতিল চিন্তা ও কর্মের পথ রুদ্ধ করবে, সৎপথ অবলম্বনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে থাকবে। এর ফলে জনগণ স্বেচ্ছাকৃতভাবে সততা ও আল্লাহভীরুতার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অনুরূপভাবে এ সমাজে মুসলমান তার দীনের অসম্পূর্ণ আনুগত্যের জন্য বাধ্য থাকে, তাহলে তাতেও তাকে তেমন কোনো জোর করে চাপিয়ে দেয়া বাধ্যতার সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যদিকে যদি তার মানস-জগতে দীনী অনুভূতি ও ঈমানী আত্মমর্যাদার ওপর অনবরত হাতুড়ি চালানো যায় তাহলেও তার দীন ও ঈমানকে তেমন কোনো প্রাণান্তকর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। সারকথা হলো এই যে, সমাজবদ্ধ জীবনের মাধ্যমেই মুসলমান তার রবের আনুগত্য ও বন্দেগীর হক সর্বতোভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলাও তার বান্দার নিকট থেকে কেবল মাত্র তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগীর হক আদায় করতে চান। এটিই তাঁর দাবী এবং এর মধ্যে তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত। এভাবে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সঠিক সমাজ জীবনের

www.pathagar.com

ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির পূর্ণতা নির্ভর করে। কাজেই সমাজ জীবন তার নিকট প্রিয় হবে না কেন ? আর যে জীবন তাঁর নিকট প্রিয় হবে তাঁর রহমত, করুণা, দান ও সাহায্যের গতি তারই দিকে হবে। বুঝা গেল যে, সঠিক সমাজ জীবনেই দীন ও ঈমানের পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব এবং মুসলমানের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এরই মধ্যে সংরক্ষিত। চিন্তা করুন, সমাজ জীবনের এ অবস্থান কত মূল্যবান এবং ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সমাজ জীবন কত অপরিহার্য!

সংসারত্যাগী মহাত্মাদের সমস্যা

এ প্রসঙ্গে এমন কতিপয় বিষয় আছে, যা মনে নানা প্রকার প্রশ্ন সৃষ্টি করতে পারে, তাই সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, অনেক মুসলিম মহাত্মার জীবন এর সমর্থক নয়। বরং তাদের জীবন প্রমাণ করে যে, সমাজ জীবন থেকে পুরোপুরি সম্পর্কচ্যুত হয়েও বন্দেগী ও আল্লাহপরস্তির উচ্চতর মর্যাদা লাভ করা যায়। কেননা তাঁরা সমাজবিহীন জীবন যাপন করেছেন এবং এ সত্ত্বেও শয়তান তাদেরকে শিকার করা তো দূরের কথা তাঁদের দিকে অগ্রসর হতেও সাহস করেনি।

এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, দুনিয়ার এমন কোনো নীতি নেই, যার ব্যতিক্রম নেই। যখন বলা হয় যে, অমুক কাজের ফল হলো এই, তখন এর সাধারণত এ অর্থ হয় না যে, কখনো এ ছাড়া এর অন্য কোনো ফল হতেই পারে না। বরং অধিকাংশ অবস্থা ও ফলাফলকে সামনে রেখেই একথা বলা হয়। বলার উদ্দেশ্য হয় এই যে, সাধারণত এমনই হয়ে থাকে। কাজেই যখন বলা হয় যে, সমাজ জীবন থেকে সম্পর্কচ্যুত ব্যক্তিকে শয়তান অতি সহজে শিকার করে, তখন আসলে এটা হয় বাস্তব ঘটনা বর্ণনার একটি পদ্ধতি এবং এর অর্থ এ হয় যে, সাধারণত এমনিই ঘটে থাকে। কাজেই যেখানে বাস্তব ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, কিছু লোক সমাজ জীবন পরিহার করেও উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহভীরু ও আবেদ হতে পেরেছিলেন, সেখানে তা এ সত্যও প্রকাশ করে যে, তাদের কিছু লোকের মোকাবিলায় লক্ষ লক্ষ লোক সমাজ জীবন থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে নিজেদের দীনকে প্রয়োজনানুগ সংরক্ষণও করতে পারেনি এবং আল্লাহর মোকাবিলায় তারা শয়তানের অধিক নিকটবর্তী হয়েছিল। এবার সামগ্রিকভাবে বিচার করুন, লাভ ও লোকসানের অনুপাত কি ? এবং

www.pathagar.com

সমাজ জীবনের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব মুসলিম জাতির জন্য কোন্ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ?

সাধারণ মানবতা, সাধারণ পরিস্থিতি ও সাধারণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই দীনের বিধান ও নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে। কোনো বিশেষ অবস্থা বা ব্যক্তিকে সামনে রেখে এসব প্রদান করা হয়নি। তাই সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য সে যে হুকুম দিয়েছে তাও সাধারণ মানুষকে সামনে রেখে দান করেছে এবং এ প্রসঙ্গে সে যা কিছু বলছে, তাও সাধারণ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই বলেছে। বলাবাহুল্য কোনো কথা উচ্চারণ করার পর এখন তা সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবার জন্য স্বীকার্য। কেননা শরীআতের বিধান সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যতই বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগী বা শক্তিসম্পন্ন লোক হোক না কেন, কোনো ব্যক্তিকেও তার আনুগত্যের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে না।

উপরন্তু এ প্রশ্ন বা সন্দেহ নীতিগতভাবেও ভুল। সমাজ জীবন থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়েও অনেক লোক আল্লাহপরস্তির উচ্চতর মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন, একথা সত্য। কিন্তু এ বিষয়টি সমাজ জীবনের গুরুত্ব ও উপকারিতার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। কেননা, এ থেকে একথা কোনোক্রমেই প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা আল্লাহপরস্তির যে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌছেছিলেন, সমাজ জীবনের মাধ্যমে তারা এর চেয়েও সুবিপুল মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। বরং সত্যি বলতে কি, এ মহাত্মাগণ যদি সত্যিকার ইসলামী জীবনের অবদানসমূহ লাভ করতেন, তাহলে ইসলামী আদর্শের মধ্যে লালিত পালিত হয়ে তাঁরা আরো বেশি উচ্চমার্গে পৌছতে পারতেন। গৃহত্যাগ করে নির্জনবাসী হয়ে তাঁরা বড় জোর ফেরেশতাদের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারবেন। কিন্তু ইসলামী সমাজের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে অবস্থান করে তাঁরা আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-এ পরিণত হতে পারেন। একথা বলার অর্থই হলো এই যে, সমাজ জীবনের আওতা বহির্ভূত থেকে এক ব্যক্তি যতই লাভবান হোক না কেন, তিনি এমন একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হতে পারেন না, যাঁর মস্তকে প্রতিনিধিত্বের মুকুট রক্ষা করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন এবং যিনি ফেরেশতাদের সিজদা লাভ করেছিলেন।

❐

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ দর্শন

সামাজিকতার উদ্দেশ্য

দুনিয়ার প্রত্যেকটি সুসংঘবদ্ধ সমাজের কোনো না কোনো নির্ধারিত উদ্দেশ্য আছে। বরং বলা উচিত যে, নির্ধারিত উদ্দেশ্যই সমাজ ও সংগঠনের অস্তিত্বের মূলে প্রেরণা যোগায়। তাই সমাজ আসলে কোনো আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্যলাভের একটি মাধ্যম মাত্র। সমাজের মূল্য ও গুরুত্ব ঐ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই নির্ণিত হয়। কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করাই যদি কোনো সংগঠনের সত্যিকার লক্ষ হয়ে থাকে তাহলে তাকে যতবেশি মূল্য ও গুরুত্ব দেয়া হোক না কেন তা অনেক কম হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যদি এমন না হয় তাহলে ঐ সংগঠন সীসা নির্মিত প্রাচীর হলেও একটি শুষ্ক তৃণের চেয়েও তার মূল্য হবে কম।

একথা যদি সকল সমাজ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত সত্য হিসেবে পরিগণিত হয়, তাহলে ইসলামের নির্ধারিত সমাজের ক্ষেত্রে তা নিছক একটি ধারণায় পর্যবসিত হবে না। ইসলামের ব্যাপারে এ সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত নীতিগত সত্যের বিরোধিতা করার কোনো কারণ নেই। তাই বুদ্ধি একথাই বলে যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে যে সমাজ, ঐক্য ও সংগঠন কায়েমের নির্দেশ দিয়েছে, তার অর্থ নিছক সমাজ, শর্তহীন ঐক্য ও সংগঠনের খাতিরে সংগঠন নয়। বরং তা অবশ্যি একটি বিশেষ ধরনের সমাজ, বিশেষ ধরনের ঐক্য ও উদ্দেশ্যমূলক সংগঠন হবে। অবশ্যি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের খাতিরে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জীবন যাপনের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু এ উদ্দেশ্যই মুসলমানদের কোনো সমাজ ও সংগঠন ইসলামী কি না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। যদি সে এ উদ্দেশ্য সাধনের সত্যিকার মাধ্যমে পরিণত হতে পারে তাহলেই সে ইসলামী সমাজ এবং আল্লাহ ও রাসূলের পসন্দনীয় সংগঠন আখ্যালাভের অধিকারী হবে এবং ইতিপূর্বে এ সমাজ ও সংগঠনের যে গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে আর পরবর্তী আলোচনায়ও বর্ণিত হবে, দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে সে অবশ্য এ গুরুত্বের অধিকারী স্বীকৃত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যদি এমন না হয়ও, মুসলমানদের এ সাংগঠনিক কাফেলাকে যদি নির্ধারিত লক্ষের দিকে অগ্রসর হতে দেখা না যায়, তাহলে তাকে ইসলামী সমাজ বলার কোনো অধিকার থাকবে না এবং জাতীয় সমাজ ও

www.pathagar.com

সংগঠনের জন্য প্রদত্ত দীনী নির্দেশাবলীকে পালনরতও মনে করা হবে না। খোদা-না-খাস্তা এর থেকেও যদি গুরুতর ব্যাপার ঘটে যায় এবং মুসলমানদের এ সংগঠন তার মৌলিক দর্শন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে যদি এমন এক রূপ লাভ করে যার ফলে ইসলামী সমাজের আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় ও তার ফলাফল এ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে অন্য কোনো উদ্দেশ্যের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে পরিণত হয়, তাহলে তা মুসলমানের সংগঠন বলে কথিত হলেও ইসলামের জন্য একটি অভিশাপরূপেই পরিগণিত হবে। তার কামনা হবে এই যে, তাকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং তার বর্তমান ভিত্তিসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার পরিবর্তে এমন এক সংগঠন কায়েম করা যার মাধ্যমে তার সামাজিক উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষের জন্য সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের নির্দেশ দিয়েছে সেটি কি ? এ প্রশ্ন থেকে যে মূল প্রশ্নের উদ্ভব হয় তা হলো এই যে, জাতি হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাদের জাতীয় দায়িত্ব কি ? কেননা কোনো জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা তার জাতীয় দায়িত্বকে কেন্দ্র করেই সে একটি জাতি ও সুসংগঠিত দলে পরিণত হয়। তাই মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার জাতীয় দায়িত্ব অবগত হওয়ার পর ইসলামের আকাঙ্ক্ষিত সমাজের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে বলেছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ -

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি উত্তম জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে করে তোমরা অন্যান্য লোকদের জন্য (সত্যের) সাক্ষ্যদানকারী হতে পারো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

"তোমরা একটি উত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ .....

اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ- الشورى : ١٣

"তিনি তোমাদের জন্য সেই দীন নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহকে দান করেছিলেন এবং যার সম্পর্কে (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার ওপর

www.pathagar.com

অহী নাযিল করেছি ..... যে, দীনকে কায়েম করো।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩

সত্যের সাক্ষ্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা এবং দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা—এ তিনটি বিষয় আসলে একই অর্থ ও সত্যকে প্রকাশ করে এবং এদের এ শাব্দিক পার্থক্য এ একটি অর্থের তিনটি বিশেষ দিককে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

কুরআন মজীদের এসব বাণী থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যে দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মুসলমানেরা এ পৃথিবীতে একটি জামাআত হিসেবে অস্তিত্বলাভ করেছে এবং একটি উম্মাত হিসেবে কার্যরত রয়েছে, তাহলো আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার সাক্ষ্য দান। তাই ঐ বাণীসমূহ থেকে পরোক্ষভাবে একথাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্যও দীনের প্রতিষ্ঠা, সৎকাজের আদেশ ও সত্যের সাক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পাদনের জন্য মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সংগঠিত সমাজ জীবনের চেতনা জাগ্রত রাখার জন্য এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অর্থ তাহলে এ দাঁড়ায় যে, মুসলমান অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কখনো একত্রিত হতে পারে না। অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাদেরকে একত্রিত করার কোনো অধিকার রাখে না, অন্য কোনো অভিযান চালাবার জন্য তাদের সংগঠন সক্রিয় হতে পারে না। মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত ও নেতৃত্বহীন সেনাবাহিনীতে পরিণত হওয়া যেমন ইসলামী জীবন নয় বরং জাহেলিয়াতের জীবন, অনুরূপভাবে ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তোলন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যদি তারা একত্রিত ও সংগঠিত হয় তাহলে তাও পরিপূর্ণ জাহেলিয়াতের নামান্তর হবে। তাই তাদের কোনো সমাজ সংগঠন এ উদ্দেশ্যের সাথে যতদূর সম্পর্কিত ও এর যত নিকটবর্তী হবে ঠিক সে অনুপাতেই তা অবশ্যি ইসলামী হবে এবং এ উদ্দেশ্য থেকে তা যে পরিমাণ দূরে অবস্থান করবে এবং এর থেকে যতটুকু সম্পর্কহীন হবে ঠিক সে অনুপাতেই তা অবশ্যি অনৈসলামী হবে। এমন কি তাদের এ ব্যবধান ও সম্পর্কহীনতা যদি মৌলিক ও প্রাকৃতিক হয় তাহলে তা হবে পুরোপুরি অনৈসলামী ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াত। তা হবে ঈমানদারের কুফরী ধরনের সংগঠন। তা এমন একটি জামাআত হবে যার পেছনে কোনোক্রমেই আল্লাহর সাহায্য থাকবে না।

www.pathagar.com

সমাজগ্রন্থী

ইসলামী সমাজের এ নির্ধারিত উদ্দেশ্য তার সমাজগ্রন্থীও নির্ধারণ করে। এ সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার সাক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে একমাত্র আল্লাহর দীনই যে এ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে, এথেকে সে বিষয়েও মীমাংসা হয়ে যায়। কাজেই কুরআন মজীদ ঈমানদারকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ দল হিসেবে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তা হলো ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص - ال عمران : ١٠٣

"তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং দলে উপদলে বিভক্ত হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

আল্লাহর এ বাণী যেমন এ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, সমস্ত মুসলমানকে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাকা উচিত অনুরূপভাবে এ বিষয়টিকেও কম সুস্পষ্ট করেনি যে, একমাত্র আল্লাহর রজ্জুই তাদেরকে সংযুক্ত করবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন ঈমানদারকে যে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত সমাজ গঠনের হুকুম দিয়েছিল, তার জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছিল যে, তার প্রত্যেক ভগ্নাংশকে তার পূর্ণাংশের সাথে একমাত্র আল্লাহর কিতাবের সম্পর্কের মাধ্যমে এবং নিছক তাঁর দীনের খাতিরে মিলিত ও সংযুক্ত হতে হবে। এ ছাড়া এ পূর্ণাংশকে পূর্ণাংশে পরিণতকারী এবং তার অংশসমূহকে পরস্পরের সাথে সংযুক্তকারী আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

আল্লাহর এ নির্দেশের ব্যাখ্যা জানতে হলে তাঁর রাসূলের কর্মজগতে প্রবেশ করুন। তাঁর কর্ম সম্পর্কে প্রত্যেক অনুসন্ধানী ব্যক্তিই জানেন যে, তিনি মানুষের সামনে আল্লাহর দীন পেশ করেন, পরকালের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত দেন। সারা জীবন তিনি এ কাজই করতে থাকেন। যে এ দাওয়াত গ্রহণ করতো, সে ইসলামী জামাআত ও সমাজের সদস্য হয়ে যেতো। তার বংশ, দেশ, বর্ণ ও ভাষা এ পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারতো না। আর যে এ দাওয়াত গ্রহণ করতো না, সে কুরাইশ ও হাশেমী খান্দানের সদস্য হলেও এ জামাআতের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতো না। এ দাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো দাওয়াতের দিকে যেমন তিনি কখনো কাউকে আহ্বান জানাননি ঠিক তেমনি এ সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলিম জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কোনো অবকাশ তিনি

www.pathagar.com

কারোর জন্য রাখেননি। এ ধরনের কোনো অবকাশের প্রশ্নই নেই বরং তিনি তো দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কাজেই 'আল জামাআত' অর্থাৎ সঠিক ইসলামী জামায়াতের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কযুক্ত হবার নির্দেশ দানের পর পরই তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اِنَّهُ مُسْلِمٌ -

"আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায় তার স্থান জাহান্নামে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে।"–আহমদ, তিরমিযী

জাহেলিয়াতের অর্থ হলো ইসলামের বিপরীত বিষয়। তাওহীদের বিপরীত অর্থবোধক হিসেবে শিরক যেমন সুস্পষ্ট এ বিষয়টিও তেমনি সুস্পষ্ট। তাই যে আহ্বান ইসলামী নয়, যাকে কুরআন হকের আহ্বান বলে স্বীকার করেনি, যা কখনো রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে শোনা যায়নি এবং যা আল্লাহর দীনে বৈধ বলে স্বীকৃতি লাভ করেনি তা জাহেলিয়াতের আহ্বান বলে গণ্য হবে। ইসলাম একটি সংগঠিত সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করার নির্দেশ দিয়েছে এবং জামাআতবিহীন জীবন যাপনের ব্যাপারে কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি মানুষকে এ সামাজিক সংগঠনভুক্ত করার দিকে আহ্বান জানায়, তাহলে এটি হবে একটি প্রকাশ্য জাহেলিয়াতের আহ্বান। অনুরূপভাবে কুরআন সকল মুসলমানকে আল্লাহর রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কাজেই এছাড়া রক্ত, বর্ণ, ভাষা তথা অন্য যে কোনো সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাদেরকে একত্রিত হবার জন্য আহ্বান জানানো হলে তা নিসন্দেহে একটি জাহেলিয়াতের আহ্বান হবে। এজন্য হাদীসে যে ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে তা অনেক ব্যাপক এলাকায় কার্যকরী হয়। তার সীমানা জাহেলিয়াতের সীমানার ন্যায় ব্যাপক। এ সীমানায় অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মুসলমানদেরকে এমন কোনো কালেমার ভিত্তিতে একত্রিত হবার, এমন কোনো সম্পর্কের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ার এবং এমন কোনো কেন্দ্রে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান করাও শামিল আছে যা ইসলামী নয়। অর্থাৎ ইসলাম তাকে মানবজাতির মধ্যে পার্থক্য করার কোনো মৌলিক ও সত্যিকার কারণ হিসেবে স্বীকার করেনি।

www.pathagar.com

অন্য এক স্থানে এ বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য নিম্নলিখিত বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ -

"যে মানুষকে পার্থিব সম্পর্কের দিকে আহ্বান করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"–আবু দাউদ

কোনো পার্থিব সম্পর্কের দিকে আহ্বান করার অর্থ হলো এই যে, ইসলামের নির্ভেজাল যুক্তি ও আকীদাভিত্তিক সমাজ সংগঠনকে বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকে বংশ, দেশ, ভাষা বা বর্ণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রিত করার চেষ্টা করা। আল্লাহবিস্মৃত ও বস্তুবাদের দাসত্বকারী জাতিরা সাধারণত এ সবের ভিত্তিতে একত্রিত হয়।

নবী করীম (স)-এর এ বাণী সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করে যে, ইসলাম ও কোনো পার্থিব সম্পর্কের আহ্বান এ দুটি বিষয় কখনো একত্রিত হতে পারে না।

মূলকথা হলো এই যে, জাহেলিয়াত ও পার্থিব সম্পর্কের আহ্বান নিতান্ত অপবিত্র বিষয় এবং ইসলামের উন্নত ও সূক্ষ্ম রুচি তাকে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারে না। কাজেই যখন শয়তানের প্রচেষ্টায় কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ ধরনের কোনো কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখনই নবী করীম (স) সাথে সাথেই তার প্রতিরোধ করেছেন এবং মন-মস্তিষ্ককে এ দূষিত পদার্থের প্রভাবমুক্ত করার ব্যাপারে মুহূর্তও দেরী করেননি। বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় জনৈক মুহাজির ও আনসারের মধ্যে বিবাদ হয়। মুহাজির আনসারের পিঠে লাথি মারে। অন্যদিকে আনসার يَالَلْاَنْصَارَ (হে আনাসাররা, ছুটে এসো!) বলে চিৎকার করে ওঠে। জবাবে মুহাজিররাও يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ (হে মুহাজিররা ছুটে এসো!) বলে চিৎকার দেয়। নবী করীম (স)-এর কানে এ আওয়াজ পৌঁছে। তিনি বলেন ঃ مَا بَالُ دَعْوٰى جَاهِلِيَّةٍ ؟ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتَنَةٌ - "এ কি জাহেলিয়াতের আহ্বান শুনতে পেলাম ? এ থেকে দূরে থাকো, কেননা এ অত্যন্ত দূষিত বিষয়।"–বুখারী

বলাবাহুল্য, 'হে আনসাররা ছুটে এসো!' ও 'হে মুহাজিররা ছুটে এসো!' আহ্বান আসলে বংশ ও দেশভিত্তিক শ্লোগান ছিল। একটি সাময়িক বিপদ প্রসঙ্গে এমনি হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কোনো

www.pathagar.com

সুপরিকল্পিত দর্শনভিত্তিক কোনো স্থায়ী জামাআত গঠনের আহ্বান ছিল না। এ শ্লোগান নবী করীম (স)-এর এত খারাপ লাগে যে, এগুলো যেন তাঁর নিকট নিছক শব্দ নয় বরং আবর্জনা স্তূপের পোকামাকড় ও দুর্গন্ধময় পদার্থ মনে হলো। কোনো মুসলমানের মুখ থেকে একথা কখনো বের হওয়া উচিত নয়। ঈমানদার ব্যক্তির রুচির পবিত্রতা একে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারে না।

যদি 'জাহেলিয়াত' ও 'পার্থিব' সম্পর্কের দিকে আহ্বানকারীর অস্তিত্ব ইসলামী সমাজে অনভিপ্রেত এবং তা জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি এ আহ্বানে সাড়া দেয় সেও জাতির মূলধন ও জান্নাতের মেহমান হতে পারে না। ন্যায়ত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে তার অবস্থাও জাহেলিয়াত ও পার্থিব সম্পর্কের আহ্বায়কদের ন্যায় হবে। কাজেই নবী করীম (স) যেখানে একথা বলেছেন যে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ সেখানে এ সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন যে, لَيْسَ مِنَّا قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ -"সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে কোনো পার্থিব সম্পর্কের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে এবং সেও আমাদের দলভুক্ত নয় যে কোনো পার্থিব সম্পর্কের জন্য প্রাণ দেয়।"

মূলকথা হলো এই যে, মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসেবে একত্রিত করার জন্য দীন ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো দ্বিতীয় সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্বন্ধ নেই। বরং এ সম্পর্কই ইসলামী সমাজের গ্রন্থী হিসেবে কাজ করতে পারে। দীন ছাড়া অন্য এমন কোনো বিষয়ের ভিত্তিতে যদি মুসলমানরা একত্রিত হয়, তাহলে এ সমাবেশকে আর যাই কিছু বলুন না কেন ইসলামী সমাবেশ কোনো ক্রমেই বলা যাবে না। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমাবেশের পদ্ধতি

এখানে এ আলোচনার আর একটি মাত্র দিক থেকে যায়। তাহলো এই যে, বাস্তব সমাজ ও সমাবেশ কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করে ? এমনিতো আগের দুটি আলোচনার পর এ প্রশ্নের জবাব জানার জন্য ধারণা ও অনুমানই যথেষ্ট তবুও বিষয়টির গুরুত্বের প্রেক্ষিতে দীনের সুস্পষ্ট নির্দেশের ওপর নিজের নিশ্চিন্ততার ভিত্তি স্থাপন করা উচিত, নিছক ধারণা ও অনুমানের ওপর নয়। এ উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় সেখানে সূরা আলে ইমরানে মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন

www.pathagar.com

যাপনের জন্য যে ব্যাপক নির্দেশ দান করা হয়েছে তার শুরুতে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর যথার্থ তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে না পৌঁছে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২

অতপর 'এবং' বলে আল্লাহর যথার্থ তাকওয়া অবলম্বন করা সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তা ইতিপূর্বেকার আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে, ঐসব কথায় যা কিছু বলা হয়েছে তা এ নির্দেশের প্রাথমিক অংশ এবং পরবর্তী কথায় তার যে দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করা হয়েছে তার অস্তিত্ব প্রথমাংশের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আল্লাহর দীনের সূত্রে আবদ্ধ ছাড়া যেমন ইসলামী সমাজের প্রকাশ সম্ভব নয় অনুরূপভাবে মুসলমানরা যদি সত্যিকার ঈমানদার না হয়, তাদের দিলে যদি তাকওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকে এবং ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্যে যদি তারা প্রবৃত্ত না হয়, তাহলে দীন কোনো কালেই তাদের সমাজ গ্রন্থীতে পরিণত হতে পারে না। এ সমাজের অংশ হওয়ার, অংশ করার ও অংশগ্রহণ হিসেবে স্থায়িত্ব লাভ করার এ একটি মাত্র আবশ্যিক শর্ত হতে পারে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ সমাজের সদস্য হওয়ার যোগ্য হতে পারে না এবং তাকে সদস্য করাও যেতে পারে না। এ গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে যত বেশি পরিপক্ক হবে সে এ জামাআতের ততোই ভালো ও নির্ভরযোগ্য অংশ হবে এবং ততোবেশি নির্ভুল পদ্ধতিতে তার সাথে সংযুক্ত থাকবে। আর এ গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে যত বেশি অপরিপক্ক হবে জামাআতের সাথে তার সম্পর্কও ততো বেশি অস্থায়ী ও অনির্ভরশীল হবে।

আবার যেসব লোক আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনে ও তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে কেবল তাদেরকেই যেমন প্রকৃতপক্ষে এ জামাআতের সদস্য বলে স্বীকার করা হয় ঠিক তেমনি যেসব লোক এ জামাআতের সদস্য হয়েছে তাদের মধ্যে এ গুণাবলীর বিকাশ সাধনের পুরোপুরি ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ কারণে এখানে আমরা কুরআন মজীদের যে আয়াতটি বিশ্লেষণ করছি, তা কেবল উপরের উল্লেখিত কথাগুলোতে শেষ হয়ে যায় না বরং পরবর্তী পর্যায়ে সেখানে আরো বলা হয় ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ۔

www.pathagar.com

"তোমাদের এমন দলে পরিণত হওয়া উচিত যে দল ভালোর দিকে আহ্বান করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

এটি আসলে পূর্বোল্লিখিত নির্দেশের তৃতীয় ও সর্বশেষ এবং এক দিক দিয়ে প্রথমাংশের শেষ অধ্যায়। এর অর্থ হলো এই যে, 'হাবলুল্লাহ' এর কেন্দ্রে সমবেত হবার পর ঈমানদারদের যে জামাআত অস্তিত্ব লাভ করে তার জন্য নিজের গণ্ডির বাইরে ও ভিতরে ভালোর দিকে আহ্বান জানানো, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং কোথাও ঈমান, ইসলাম ও তাকওয়ার নীতি ও দাবীসমূহ বিধ্বস্ত হতে দেখলে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র এ অবস্থায়ই আশা করা যেতে পারে যে, এ সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্টি হতে ও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। এ কারণেই কথা, কর্ম ও চরিত্রের পরিশুদ্ধিই ছিল শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন তাঁকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেওয়ার এবং যে ব্যক্তি এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাকে আল্লাহর আয়াত শুনাবার, কিতাবের (আল্লাহর নির্দেশাবলী) শিক্ষা দান করার ও হিকমত (দীনের গূঢ় অর্থ) শেখাবার يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ। দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অনুরূপভাবে দাওয়াত গ্রহণকারীদের জ্ঞান, কর্ম ও চারিত্রিক ত্রুটির সংশোধন ও পরিশোধনের। –(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯)। وَيُزَكِّيْهِمْ দায়িত্বও তাঁকে দান করা হয়েছিল। তিনি নিজের দায়িত্ব থেকে চুল পরিমাণও এদিক ওদিক হননি। কাজেই ইতিহাসের প্রশস্ত ললাটে প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সুস্পষ্ট সত্য প্রত্যক্ষ করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এর থেকে কম পর্যায়ের কোনো কথায় রাজি হননি এবং এর চেয়ে বেশি কোনো কাজের দাবীও করেননি। তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁরই বন্দেগীর দিকে আহ্বান করেন। যেসব লোক এ আহ্বানে সাড়া দেন কেবল তাদেরকেই মুসলিম জাতির মধ্যে শামিল করেন। আর যাদেরকে এ জাতির মধ্যে শামিল করেন, তাদেরকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঈমান, ইসলাম ও তাকওয়ার গুণাবলীর বিকাশ সাধন করায় ব্যাপৃত থাকতেন। এসব কিছুই নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এবং এরই বদৌলতে ইসলামী সমাজ ও মুসলিম জাতির অস্তিত্ব লাভ করেছে।

❐

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজের রূপরেখা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্যতা

সমাজ দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ ও শেষ মঞ্জিল হলো একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। আসলে এ ব্যবস্থা লক্ষ নয় কিন্তু কার্যত মানব সমাজের জন্য এটি একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। কেননা মানুষ তার স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী একতাবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এটি একটি বাস্তব সত্য। অনুরূপভাবে এও একটি বাস্তব সত্য যে, তাদের এ সমষ্টিবদ্ধ জীবন যাপনের ফলে এমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেগুলোর সমাধান অতীব প্রয়োজন। এ প্রয়োজন সন্তানের জন্য মাতৃক্রোড় ও পিতৃ অনুগ্রহের সমপর্যায়ের। কেননা এ সমস্যাবলী এক দিকে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে এবং অন্যদিকে অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী হয়। বাইরে এদের কোনো উৎস না থাকার কারণে এরা স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে। এ সমস্যাবলী কখনো সৃষ্টি হয় আবার কখনো হয় না, এমনটি নয়, বরং মানুষের অভ্যন্তরই এদের উৎস। মানুষের প্রকৃতিই এগুলোর জন্মদাতা। তাই মানুষ যতক্ষণ তার প্রকৃতির উর্ধে উঠে তার বন্ধন মুক্ত না হয়—যা কমপক্ষে শতকরা নিরানব্বই জনের পক্ষে অসম্ভব—ততক্ষণ এ সমস্যাবলী অবশ্যি সৃষ্টি হবে এবং স্থায়ীভাবে বিদ্যমানও থাকবে। 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' হয় এজন্য যে, এগুলোর কারণে সমাজ লক্ষচ্যুত হয় বরং বলা যায় যে, তার বাস্তব ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টো হতে থাকে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ভালোর সাথে সাথে মন্দের শক্তিও ক্রিয়াশীল। মানব জাতির কর্মের সমগ্র ইতিহাস একথারই সাক্ষ্যবহ। কুরআন মজীদও সুস্পষ্টভাবে একথাই ঘোষণা করে, কুরআন বলে ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের দিলে তাকওয়া ও অসৎ কর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন- (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)। এ বাস্তব বিষয় সাপেক্ষে স্ব স্ব প্রকৃতিসহ বহুলোক যখন একতাবদ্ধভাবে অবস্থান করবে, তখন নিশ্চিতরূপে তাই সংঘটিত হবে, যা প্রতি মুহূর্তে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। অর্থাৎ একদিকে যদি অন্যের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা, কল্যাণ কামনা, সহানুভূতি ও ত্যাগের নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে অন্যদিকে ব্যক্তিদের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘর্ষ হবে, স্বার্থে দ্বন্দ্ব হবে, স্বার্থপরতার সংঘাত হবে। আর এর ফলে পরস্পরের ওপর যুলুম অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

হবে, অধিকার বিপর্যস্ত হবে এবং কারোর ধন-প্রাণ-ইয্যত-আব্রু কোনো জিনিসই সংরক্ষিত থাকবে না। এর অর্থ হবে এই যে, যে সমাজ দর্শনকে মানুষ নিজের মানসিক শান্তি ও আশ্রয়স্থল মনে করে গ্রহণ করবে, তা তার প্রাণ সংহারকারীতে পরিণত হবে, এ অবস্থায় সঙ্গতভাবে তার জন্য দুটি পথ থেকে যায়। এক, তাকে এ সমাজ দর্শন পরিহার করতে হবে। দুই, অথবা ঐ সমস্যাবলীর কোনো সমাধান নির্ণয় করতে হবে। প্রথম পথটি সে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা তার প্রকৃতিতে প্রেরণা ও আবেগ এর অনুমতি দেবে না এবং তার অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা নীতিও তাকে এ কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে না। তাই কার্যত ঐ স্থায়ী ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর কোনো স্থায়ী ও প্রভাবশালী সমাধান নির্ণয় করা ছাড়া তার জন্য দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। অন্য কথায়, এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘাত ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে। এমন একটি শক্তির প্রয়োজন, যা যুলুমকারী হস্তকে প্রতিহত করবে, দুর্বলের সংরক্ষণ করবে, মযলুমের সাহায্য করতে ও তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। কোনো প্রকার বিতর্ক ও যুক্তি ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, এ ব্যবস্থাপনা ও শক্তির দ্বিতীয় নাম রাষ্ট্র অর্থাৎ একমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থাই কোনো সমাজ-সংগঠনের মধ্যে শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে ও তাকে স্থায়িত্ব দান করতে পারে। এটি একটি সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক সত্য এবং মানব প্রকৃতির প্রোজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত এর অস্বীকার সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে ইবনে খালদুনের বক্তব্যে কোনো প্রকার অতিশয়োক্তি ছিল না যখন তিনি বলেছিলেন যে, "মানুষ যেমন প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক জীব অনুরূপভাবে যথার্থ প্রকৃতিগত কারণেই সে এমন একজন শাসকের মুখাপেক্ষী যে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে পরস্পরের অধিকার হরণ করা থেকে বিরত রাখবে।"

আবার এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোনো সমাজ-সংগঠনের কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন নয় বরং তার বাইরেরও প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া সমাজ তার অস্তিত্ব ও স্বার্থের যথাযথ সংরক্ষণ করতে পারে না। কেননা মানব প্রকৃতির দুর্বলতাসমূহ যেভাবে একটি সমাজের ব্যক্তিবর্গকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুলুমে উদ্বুদ্ধ করে অনুরূপভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও জাতিকেও পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষশীল করে তোলে এবং কোনো জাতি নিজের বিরুদ্ধে ধ্বংসকর কার্যকলাপ থেকে কখনো নিশ্চিন্ত থাকে না। এ অবস্থায় এজন্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখা তার প্রাথমিক না হলেও অবশ্যি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের মধ্যে শামিল হবে। একথা ঠিক যে, প্রয়োজন

www.pathagar.com

হলে সমাজের ব্যক্তিবর্গ আত্মরক্ষার এ দায়িত্ব সম্পাদন করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি তাদেরকে নিজেদের স্বতন্ত্র মতামত ও সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাদের প্রত্যেকে তার ইচ্ছামত যেভাবে ভাল মনে করে এ দায়িত্ব সম্পাদন করে, তাহলে সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত। কোনো বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনী আজো কোনো সংঘবদ্ধ হামলার মুকাবিলা করতে পারেনি। তাই ব্যক্তি যতই কর্তব্যনিষ্ঠ, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও প্রাণ উৎসর্গকারীই হোকনা কেন, যদি সে কোনো নেতৃত্ব ও আনুগত্য ব্যবস্থার অধীন না হয় তাহলে সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে সে কোনোক্রমেই সক্ষম হবে না। অন্য কথায় বলা যায় যে, প্রত্যেক সমাজ আত্মরক্ষার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী। যেসব মৌলিক কারণ মানুষের জন্য সমাজ সংগঠনকে অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত করে এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও তার প্রয়োজন সেগুলোর অন্যতম। তাই এ মুখাপেক্ষিতার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সমাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

ইসলাম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

মুসলিম সমাজও মানুষের সমাজ। এমন সব মানুষের দ্বারা এ সমাজ গঠিত যাদের মধ্যে ভালো মন্দ উভয় শক্তিই ক্রিয়াশীল। যাদের হৃদয়ে অসৎবৃত্তি ও তাকওয়া উভয়েরই প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তাই মন্দ ও অসৎ প্রবণতার প্রভাব মুক্ত থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা সকল প্রকার সৎবৃত্তি ও তাকওয়া থাকা সত্ত্বেও মুসলমান মানুষই থাকে, ফেরেশতায় পরিণত হয় না। তাই তাদের সমাজেও হামেশা মানব প্রকৃতির দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, হামেশা পাওয়া গেছে ও ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। ইসলামী শরীআতে অপরাধ দণ্ডবিধির যে দীর্ঘ ফিরিস্তি রয়েছে এবং মোকদ্দমাসমূহ সম্পর্কে যে বিস্তারিত নির্দেশাবলীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তা প্রমাণ করে যে, ইসলামও নিজের অনুসারীদের সম্পর্কে এ ধরনের কোনো ধারণা রাখে না যে, অসৎ প্রবণতা ও যুলুম তাদের নিকট ঘেঁষতে পারে না এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপও গ্রহণ করে না। বরং সে তাদেরকে সাধারণ মানুষের পর্যায়েই ধারণা করে, যার প্রকৃতিতে ভালো ও মন্দ উভয়ের সংমিশ্রণ আছে এবং সে যে কোনো সময় যে কোনো প্রকার ভুল করতে পারে। তাই নিজেদের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অন্যান্য সমাজ যেমন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী থাকে, তেমনি এ ইসলামী সমাজও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। বরং সত্যি বলতে কি ইসলামী

www.pathagar.com

সমাজ আরো বেশি করে এ প্রয়োজন অনুভব করে। কেননা ইসলাম মানুষকে ধন ও প্রাণের যে অধিকার দান করেছে তা কদাচিৎ অন্য কোথাও পাওয়া যেতে পারে।

এখন প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মুসলিম সমাজের ঠিক ততখানিই থাকবে যতখানি অন্যান্য সমাজের হতে পারে। কেননা পৃথিবীতে যতদিন ইসলাম বিরোধী শিবিরের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আশংকা প্রতি মুহূর্তেই বিরাজ করবে এবং এর মাঝে তার বাস্তব রূপও দেখা যাবে। তাই ইসলামী সমাজের যথাযথ সংরক্ষণ ও সকল প্রতিরক্ষার জন্যও একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম রাখার প্রয়োজন অত্যধিক।

সারকথা হলো, যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, এ সমাজও একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষিতার ক্ষেত্রে কারো চেয়ে কম অগ্রসর নয় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও তার একটি প্রাকৃতিক চাহিদা ও অপরিহার্য প্রয়োজ নের মধ্যে শামিল।

শরীআত নির্দেশিত খেলাফত ব্যবস্থা

এ আলোচনা থেকে মুসলিম সমাজের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যদিও পুরোপুরি পরিস্ফুট হয় তবুও এর ভিত্তি পরিপূর্ণভাবে যুক্তি ও চিন্তার ওপর স্থাপিত। অথচ এ আলোচনা কোনো মানবিক চিন্তাধারা সম্পর্কে নয় বরং দীন ও ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে চলছে। এজন্য শরীআতের নিজস্ব ব্যাখ্যা অবগত হওয়া উচিত এবং সিদ্ধান্তের আসল ভিত্তি তার ওপর রাখা উচিত। অন্যথায় অনেকে বলতে পারেন যে, যার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে হয়তো ইসলাম মুসলিম সমাজকে সে দৃষ্টিকোণ থেকে নাও দেখতে পারে।

এ উদ্দেশ্যে শরীআতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সেখানে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম করা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী, রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য সম্পর্কে মুসলিম আলেমগণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে।

কুরআন সম্পর্কে বক্তব্য হলো এই যে, কুরআন মুসলমানদেরকে নিজেদের 'উলিল আমর' অর্থাৎ নেতা ও শাসকগণের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের

www.pathagar.com

আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করো।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯) অন্যদিকে তাদের ওপর এমন অনেক আইন প্রবর্তনের দায়িত্ব দিয়েছে যেগুলোকে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া প্রবর্তন করা সম্ভবপরই নয়। যেমন, হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দান, চোরের হাত কাটা, যিনাকারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা বা কোড়া মারা প্রভৃতি। এ দুটি কথাই ঘোষণা করে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ পরিপূর্ণভাবে একটি রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজ। রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণাবিহীন মুসলিম সমাজের কোনো ধারণাই কুরআন পেশ করে না অথবা কমপক্ষে অন্য কোনো ধারণা সে পেশ করতে চায় না। তবে কুরআন সরাসরি বলে না যে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম কর। একথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও স্থিরীকৃত সত্য সম্পর্কে অযথা ঘোষণা বাণী হতো। যেখানে গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের প্রাখর্যের আলোচনা চলে সেখানে সূর্যের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার কোনো অবকাশই থাকে না। মুসলমানদের নিকট তাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের প্রতি আনুগত্যের দাবী করা ও তাদেরকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি সরকারের ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত দায়িত্বশীল গণ্য করা দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, তারা রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করে অথবা তাদেরকে এভাবে জীবনযাপন করা উচিত। যে আয়াতগুলোয় মুসলমানদেরকে একটি সরকারের ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো দায়িত্বশীল গণ্য করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি আয়াতের وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا -"চোর এবং চুরনীর উভয়ের হাত কেটে দাও।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৮)। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন ঃ

"কালাম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমগণ এ আয়াতটিকে মুসলমানদের জন্য নিজেদের মধ্যে একজন ইমাম (শাসক) নিয়োগ করার অপরিহার্যতার প্রমাণ বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মাধ্যমে চোর ও যিনাকারীদের শাস্তি দেয়াকে ফরয ঘোষণা করেছেন। তাই এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন যে আল্লাহর এ ফরমানকে কার্যকরী করার জন্য সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অন্যদিকে সমগ্র জাতি এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করে যে, সাধারণ লোকেরা অপরাধীদের শাস্তি দানের অধিকার রাখে না বরং স্বাধীন অপরাধীদের শাস্তিদানের প্রশ্নে মুসলমানদের সর্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে এই যে, ইমাম ছাড়া আর কারোর জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া জায়েয নয়। কাজেই অপরাধীর

www.pathagar.com

শাস্তি দান করা যখন একটি অপরিহার্য দায়িত্ব এবং একজন ইমাম ছাড়া এ দায়িত্ব সম্পাদন সম্ভব নয়—উপরন্তু এও একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, যে কার্যের ওপর কোনো ওয়াজিব কার্য সম্পাদন নির্ভর করে এবং তা ক্ষমতা ও সামর্থ বহির্ভূত নয়, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওয়াজিব হয়ে যায়—তখন ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব ও অপরিহার্য।"

–তাফসীরে কবীর তৃতীয় খণ্ড ঃ ৪১৫ পৃষ্ঠা

এখন আসে হাদীসের প্রশ্ন। এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজের জন্য একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কিত বহু হাদীস আলোচিত হয়েছে। বিষয়টিকে সামনে রাখার জন্য তা থেকে দুটি বিশেষ হাদীসের পুনরুল্লেখ করছি ঃ

(١) مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

১. "যে ব্যক্তি মুসলিম খলীফার বাইয়াতের শৃঙ্খল গলায় পরিধান না করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।"–মুসলিম

(٢) اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

২. "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি ঃ ১. সমাজবদ্ধ জীবনের, ২. শ্রবণ করার (নির্দেশাবলী শ্রবণ করার), ৩. আনুগত্যের (বিধিনিষেধের অনুগত থাকার), ৪. হিজরতের ও ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করার।"–আহমদ, তিরমিযি, মিশকাতের উদ্ধৃতি অনুযায়ী, ৩২১ পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রথম হাদীসটির বর্ণনাভঙ্গী ইতিপূর্বে বর্ণিত কুরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গীর সমতুল্য। খলীফার হাতে বাইয়াত থেকে বঞ্চিত মানুষ জাহেলিয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ উক্তিটির পরিষ্কার অর্থ হলো এই যে, খেলাফত ব্যবস্থা ছাড়া মুসলিম সমাজের অস্তিত্বই থাকতে পারে না অথবা কমপক্ষে খেলাফত ব্যবস্থাবিহীন মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। এ প্রেক্ষিতে একথাই ঘোষিত ও প্রকাশিত হচ্ছে যে, খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এ সমাজের একটি অপরিহার্য ও স্বাভাবিক দায়িত্ব। কেননা এ বস্তুজগতে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং কোনো মানবগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মুসলিম সমাজও ততক্ষণ 'রাষ্ট্রভিত্তিক' হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজেই এর দায়িত্ব অনুভব করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হাদীসটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশের প্রকাশ। কেননা এতে এমন একটি সামষ্টিক জীবনযাপনের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা কোনো মামুলি পর্যায়ের নয়। এ সমষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নির্দেশ 'শ্রবণ' করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তার 'আনুগত্য' করে। অর্থাৎ এখানে সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ জারি হয়। এখানে একজন হুকুমদাতা থাকে এবং মানুষ তাঁর আনুগত্য করে। অন্য কথায় এটি একটি শাসন ও আনুগত্যের অধিকারী অথবা 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান' সম্পন্ন সামষ্টিক জীব। কেননা 'শ্রবণ' ও 'আনুগত্যের' অস্তিত্ব কোনো না কোনো পর্যায়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। যেখানে রাষ্ট্র নেই সেখানে 'শ্রবণ' ও 'আনুগত্যে'রও কোনো প্রশ্ন থাকবে না। এ শব্দ দুটি হাদীসের বহুস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সর্বত্রই এর অর্থ হচ্ছে নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের আনুগত্য।

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ সমগ্র দুনিয়ার নিকট সুস্পষ্ট। তিনি পরোক্ষভাবে প্রথম থেকেই হুকুম ও নির্দেশদাতা ছিলেন। কিন্তু হিজরতের পর তাঁর এ মর্যাদা বাহ্যত ও পারিভাষিক অর্থেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং এরপর থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা অধিকতর প্রকাশিত থাকে। ঈমানদারগণ এক জাতি, এক মিল্লাত ও এক জামাআতভুক্ত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন তাদের নেতা। সমগ্র মুসলিম এলাকা একটি রাষ্ট্র ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন তার শাসক। সারকথা হলো এই যে, রাষ্ট্র ও গভর্নমেন্ট বলতে যা বুঝায় মুসলিম অধিবাসীগণ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করেছিল। এর অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ তাঁর মাদানী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের সাথে, মুসলিম সমাজের সাথে, রেসালাতের পদমর্যাদার সাথে একটি রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা নীতিগতভাবে সবসময় এবং কার্যত সম্ভাব্য পর্যায়ে অবশ্যি সংশ্লিষ্ট ছিল। অন্যথায় স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহর রাসূল এমন একটি কাজ করেছেন এবং বার বার করেছেন আল্লাহর দীনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এমন একটি মর্যাদা লাভ করেছেন যা নবুওয়াতের দাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। কিন্তু এ ধারণা পোষণ করা অন্যের জন্য হয়তো সম্ভব হতে পারে কিন্তু যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবী বলে স্বীকার করে তাদের জন্য সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে সাহাবীদের আদর্শ নিম্নরূপ ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকাল হয় তখন সাহাবীগণ যে কাজটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং অন্যান্য কাজের ওপর যেটিকে অগ্রাধিকার দান

www.pathagar.com

করেন তাহলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফা নির্বাচন ও খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এমন কি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাফন করার কাজটিও তাঁরা পিছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃতদেহ রেখে দিয়ে তাঁরা খলীফা নির্বাচনে ব্রতী হন এবং খলীফা নির্বাচিত হবার পর দাফন কার্যসম্পন্ন করেন। সাহাবীগণের এ কার্যপদ্ধতিতে কোনো মতবিরোধ ছিল না এবং এটি সাময়িকও ছিল না। বরং এটি ছিল সর্ববাদীসম্মত ও স্থায়ী কার্যপদ্ধতি। অর্থাৎ তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অতপর পরবর্তীকালে এ একই নীতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীকালেও যখন কোনো খলীফার ইন্তেকাল হয়েছে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন না করা পর্যন্ত তাঁরা তাঁর মৃতদেহ দাফন করার দিকে দৃষ্টি দেননি (শারহে আকায়েদে নসফী ১১০ পৃষ্ঠা)। সাহাবীগণের এ সর্বসম্মত ও স্থায়ী কার্যপদ্ধতি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের যে গভীর অনুভূতির পরিচায়ক পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ তার কোনো নজীর পাওয়া যেতে পারে। মুসলিম সমাজ কখনো একজন ইমাম ও খলীফা ছাড়া ; অন্যকথায় একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানবিহীন অবস্থায় কোনোক্রমেই থাকতে পারে না সে সম্পর্কে এটি ছিল তাঁদের সংশয়াতীত ঐকমত্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণের এক সমাবেশকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

اَلاَ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَلاَ بُدَّ لِهٰذَا الدِّيْنِ مِمَّنْ يَّقُوْمُ بِهٖ-

"জেনে রেখো মুহাম্মাদ (স) ইন্তেকাল করেছেন এবং এখন এ দীনের জন্য এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে এর (প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনের) দায়িত্ব গ্রহণ করবে।"-কিতাবুল মাওয়াকিফ ও শারাহুহু, ৮ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা

একজন খলীফা নির্বাচন ও তাঁর নিযুক্তি ছাড়া একথা বলার পিছনে হযরত আবু বকর (রা) আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। একথা সাহাবীগণের বিপুল সমাবেশে বলা হয়। তাঁদের একজনও এর সত্যতা ও যথার্থতা অস্বীকার করেননি।

হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন ঃ

لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِالْجَمَاعَةِ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ-

"জামাআত বিহীন ইসলাম সত্যিকার ইসলাম নয় এবং আমীর বিহীন জামাআত সত্যিকার জামাআত নয়।"-জামে বায়তুল ইলম

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যখন খারেজিরা 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ'-এর শ্লোগান তোলে, তখন তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ لاَ اِمَارَةَ وَلاَ بُدَّ مِنْ اِمَارَةٍ بِرَّةً اَوْ فَاجِرَةً -

"তাদের বক্তব্য হলো এই যে, কোনো কর্তৃত্ব (ও রাষ্ট্র) হওয়া উচিত নয় অথচ কর্তৃত্ব ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় অপরিহার্য।"

–আল মিলাল ওয়ান নিহাল লিশ শাহরিস্তানী ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যথার্থ উত্তরাধিকারী ও আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্রগণের এ বাণীসমূহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করুন—এমন কোনো শব্দ আছে কি ? একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দীন ও মিল্লাতের অপরিহার্য প্রয়োজন রূপে প্রকাশ করার জন্য যাকে ব্যবহার করা যেতে পারে ; কিন্তু প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তাকে সে অর্থে ব্যবহার করা হয়নি ?

কুরআন, হাদীস, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কার্যাবলী ও বাণী এবং সাহাবীগণের কার্যাবলী যে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনের সাক্ষ্য দেয় এবং এমন সুস্পষ্ট ও চরম সাক্ষ্য দেয়, সেখানে শরীআত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ ছাড়া আর কি বা বলতে পারতেন যে, মুসলিম সমাজের জন্য এটি একটি অপরিহার্য প্রয়োজন এবং এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠা রাখা তার দীনী কর্তব্যের অঙ্গীভূত ? তাই কাযী মাওয়ার্দী লিখেছেন ঃ

عَقْدُهَا لِمَنْ يَّقُوْمُ بِهَا فِى الْاُمَّةِ وَاجِبٌ بِالاِجْمَاعِ -

"উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি নেতৃত্বের (খেলাফতের) দায়িত্ব পূর্ণ করার যোগ্যতা রাখে তার জন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব।"

–আল-আহকামুস সুলতানিয়া

অনুরূপভাবে আল্লামা তাফতাযানী শারহে আকায়েদে নাসাফিয়ায় বলেছেন ঃ

اَلاِجْمَاعُ عَلٰى اَنَّ نَصْبَ الْاِمَامِ وَاجِبٌ -

"ইমাম (অর্থাৎ খলীফা) নিযুক্ত করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[১]–১১০ পৃষ্ঠা

১. এ ঐকমত্যে খারিজীদের ছাড়া সবাই শামিল আছে। তবে ইমামিয়া ও ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ইমাম নিযুক্তি ওয়াজিব হলেও তা মানুষের দায়িত্ব নয়, আল্লাহর দায়িত্ব। খারিজীদের মতে, ইমাম নিযুক্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা জায়েয, ওয়াজিব নয়।–(কিতাবুল মাওয়াকিফ ওয়া শারাহুহু, ৮ম খণ্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এ দুটি চিন্তা যুক্তি, শরীআত ও বাস্তব অবস্থা সকল দিক থেকেই এত বেশি দুর্বল যে, এর প্রতিবাদ করার কোনো দরকার হয় না।

www.pathagar.com

অর্থাৎ উম্মতের জন্য নিজস্ব একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা শরীআতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। যদি সে নিজের এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে এটি হবে একটি সামষ্টিক গোনাহ। এজন্য তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

পরে তিনি এর স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করে বলেন ঃ

وَلاَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ـ

"আর এজন্য শরীআতের অনেক ওয়াজিব অনুষ্ঠান এরই (নেতৃত্ব) ওপর নির্ভর করে।"(ঐ)

আসলে এ ওয়াজিব কর্তব্যগুলো সম্পাদন করাই শরীআতের মৌলিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছিল এবং এরই ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (স) উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ বলেন ও সম্পাদন করেন। যে রাষ্ট্র ছাড়া দীনের অসংখ্য ওয়াজিব সম্পাদন সম্ভব নয়, তা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে দীন কেমন করে যথার্থরূপে উপস্থিত থাকতে পারে ? একথা স্বীকার করতে হবে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া ইসলাম যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গরূপে কখনো প্রকাশিত হতে পারে না। সাধারণ জ্ঞান একথা বলতে বাধ্য হবে যে, যে ইসলামের নিকট কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই, তার অবস্থা একটি খোঁড়া জরাগ্রস্ত পংগু দেহের ন্যায়। এরূপ দেহকে হয়তো মৃতদেহ বলা যাবে না কিন্তু একটি সুস্থ-সমর্থ অস্তিত্ব গণ্য করাও যেতে পারে না এবং সুস্থ-সমর্থ দেহের অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে যে কার্য সম্পাদনের আশা করা যায়, এর সাহায্যে কখনো তা সম্ভব নয়।

ইসলামের সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থার এ অপরিহার্য সম্পর্ক কেবল কুরআন ও শেষ নবী প্রচারিত 'ইসলামে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রত্যেক নবীর 'ইসলাম' ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যেকটি দীন পর্যন্ত এর সীমা পরিব্যপ্ত। তাই মুসলিম জাতির পূর্ববর্তী জাতি (বনী ইসরাঈল) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ـ

"বনী ইসরাঈলদের শাসন পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ। একজন নবীর ইন্তেকাল হলে তাঁর স্থলে আর একজন নবী প্রেরিত হতেন।"–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

বিভিন্ন যুগে বাহ্যত এ 'শাসনের' যে আকৃতি থাকুক না কেন, এতটুকুন অবশ্যি স্বীকার করতে হবে যে, সর্বাবস্থায় তা আসলে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাই

www.pathagar.com

ছিল। অবশ্যি তন্মধ্যে উচ্চমানের ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেছে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর আমলে। উপরোল্লিখিত হাদীসটির বর্ণনাভংগি পর্যালোচনা করুন। এ থেকে শুধু একথাই জানা যায় না যে, ইসরাঈল জাতির মধ্যে সাধারণত সকল সময় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তার পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি তাদের নবীদের ওপর অর্পিত ছিল বরং এও জানা যায় যে, ঐ নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যের মধ্যেও এ কাজটি শামিল থাকত। এ বিষয়টি দীনের জন্য রাজনীতি ও দীনদারদের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনকে উজ্জ্বলতর করে।

খেলাফতের দায়িত্ব

খেলাফতের মর্যাদায় যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে তার কাজ সাধারণ শাসকদের থেকে অনেক ব্যাপক ও ভিন্নতর হবে। এ মর্যাদা হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরীআত প্রদত্ত একটি মর্যাদা। শরীআত তার অসংখ্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এ মর্যাদাটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই খলীফার কর্তব্য হবে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। এ উদ্দেশ্যকে এক কথায় ব্যক্ত করতে গেলে বলা যায়, আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন বাণী থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا۔

"যদি এমন কোনো ক্রীতদাসকে তোমাদের আমীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, যার অঙ্গ কেটে দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী তোমাদের ওপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে তার কথা শ্রবণ করো ও তার আনুগত্য করো।"–মুসলিম

আর এক সময় বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوْا الدِّيْنَ۔ بخارى، كتاب الاحكام

"এ বস্তুটি (অর্থাৎ খেলাফত) কুরাইশদের মধ্যে থাকবে। এ বিষয়ে যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধাবে আল্লাহ পাক তাকে ভূপাতিত করবেন, তবে যতক্ষণ তারা (কুরাইশেরা) দীনকে কায়েম রাখবে।"
–বুখারী, কিতাবুল আহকাম

এ হাদীসগুলো পর্যালোচনা করার পর এ সত্যটি আবরণমুক্ত হয় যে, কোনো আমীরের জনগণের ওপর কর্তৃত্ব করার ও কোনো খলীফার

www.pathagar.com

জনগণের ওপর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার সত্যিকার অধিকার ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ তিনি শরীআতের বিধান ও অনুশাসন অনুযায়ী নিজের কর্তব্য পালন করেন এবং আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, যে উদ্দেশ্য ও যে কর্তব্যের খাতিরে একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় তার ওপর সে মর্যাদার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভর করে। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বাণীসমূহের সুস্পষ্ট অর্থ হলো এই যে, একমাত্র দীনের প্রতিষ্ঠাই খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং এটিই খলীফার একমাত্র কর্তব্য।

ঊপরন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাণী ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকাল হয়েছে এবং এখন এ দীনের জন্য এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি একে প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। একথাটি আসলে শুধু হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নয় বরং সকল সাহাবীরই কথা ছিল। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যই খলীফার অস্তিত্বের প্রয়োজন এবং এ একটি মাত্র কর্তব্য তাঁকে সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়গুলোর উপস্থিতিতে আলেমগণ যথার্থ 'ইমামতের' (অর্থাৎ খেলাফত) সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هِيَ خِلَافَةُ الرَّسُوْلِ فِيْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ -

"ইমামত হলো দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তরাধিকারী।"–কিতাবুল মাওয়াকিফ

দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ দীনের ন্যায়-ই ব্যাপক ও সার্বজনীন। কুরআন ও সুন্নাতের যত বিধান আছে সমস্তই দীন। তাই দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো মুসলিম সমাজকে দীনের সামগ্রিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। এ ক্ষুদ্র কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে নেই এবং তার কোনো প্রয়োজনও নেই। তবে এর মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যি জেনে নেয়া উচিত। তাহলে খলীফার কর্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যাবে। এ উদ্দেশ্যে যদি আপনি শরীআত যে জন্য এ মর্যাদার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় গণ্য করেছে তার কারণসমূহের দিকে লক্ষ করেন তাহলে নিম্নিলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন ঃ

১. আদর্শিক ও তত্ত্বগত দিক থেকে দীনের সংরক্ষক, দীনের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার এবং মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রতি বিশ্বাসের স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন।

www.pathagar.com

২. দীনের বাস্তব ভিত্তিসমূহকে (নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ) প্রতিষ্ঠিত রাখা ও সমাজে তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার গাফলতি সৃষ্টি হবার সুযোগ না দেয়া।

৩. দীন ও মিল্লাতের শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ও জিহাদের যাবতীয় কর্তব্য পালন করা।

৪. ব্যবহারিক বিষয়াবলীর মীমাংসা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা।

৫. অপরাধীদের শাস্তি বিধান।

৬. সমাজের ব্যক্তিবর্গের ধন-প্রাণ, ইয্যত-আবরু সংরক্ষণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৭. দুর্বল ও অভাবীদেরকে সাহায্যদান।

৮. সমাজের ভিতরে বাইরে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার পূর্ণ ব্যবস্থা করা।

ইচ্ছা করলে আপনি আরো কিছু বিষয়ের নাম নিতে পারেন। কাজেই কোনো কোনো আলেম খেলাফতের কার্যাবলীর সংখ্যা এ থেকে অনেক বেশি বলেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এ প্রসঙ্গে আর যতগুলো বিষয়ের নাম নেয়া যাবে সমস্তই এ আটটি বিষয়ের কোনোটির মধ্যে শামিল হবে অথবা কোনো মৌলিক বিষয় হবে।

খেলাফতের অধিকার

খেলাফত বা মুসলমানদের খলীফার দায়িত্ব যত ব্যাপক ও সার্বজনীন তাঁর অধিকারও তত বিরাট। তার ন্যায় বিপুল অধিকার দুনিয়ার অন্য কোনো সরকার বা শাসকের নেই। তাঁর অধিকারসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. আনুগত্য ঃ তাঁর সর্বপ্রথম অধিকার হলো এই যে, তাঁর নির্দেশ সবাইকে শুনতে হবে ও পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের আনুগত্য করো।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

এ আয়াতে কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের আনুগত্যের যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে নিসন্দেহে মুসলমানদের খলীফার নাম তালিকার প্রথমে স্থান পেয়েছে এবং ঈমানদারদের জন্য এটিকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এটি এমনই অপরিহার্য যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশের পাশাপাশি এ নির্দেশটিও দেয়া হয়েছে। এ বিশিষ্ট আয়াতটির দাবী সম্পর্কে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই অনবগত নন।

রাসূলুল্লাহ (স) এ দাবীর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ يَّعْصِنِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ-

"যে আমার হুকুম মেনে চলে সে আসলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, যে আমার নাফরমানী করে সে আসলে আল্লাহর নাফরমানী করে। আর যে নিজের আমীরের হুকুম মেনে চলে সে আসলে আমার হুকুম মেনে চলে এবং যে আমীরের নাফরমানী করে সে আসলে আমার নাফরমানী করে।"–মুসলিম

যে আনুগত্য সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে পরিণত হয়, তা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা ও সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। ব্যক্তির স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতার উর্ধে ওঠাই তার অধিকারে পরিণত হয়। কাজেই ঠিক এমনটিই হয়েছে। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন ঃ

دَعَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِىْ مَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ...

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলোর ওপর আমাদের শপথ গ্রহণ করলেন ঃ পসন্দ হোক বা অপসন্দ, আমরা সচ্ছল অবস্থায় থাকি বা অসচ্ছল—সর্বাবস্থায় আমরা নিজেদের আমীরগণের নির্দেশ শুনবো ও তাঁদের আনুগত্য করবো।"–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

অতপর শুধু এ নয় যে, বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ও অসচ্ছল অবস্থায়ও শ্রবণ ও আনুগত্য একজন মুসলমানের জন্য ফরয বরং এমন পরিস্থিতিতেও এ ফরয অব্যাহত থাকে, যখন হুকুমদাতা হয় অকর্মণ্য এবং অধিকারের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের দিকে সর্বপ্রথম নজর দেয়। তাই আনুগত্য সম্পর্কিত উল্লেখিত হাদীসে পরবর্তী পর্যায়ে এ শব্দও সংযোজিত হয়েছে–

www.pathagar.com

وَاَثَرَةٍ عَلَيْنَا۔

"এবং তখনও আনুগত্য করবো যখন আমাদের বিরুদ্ধে কোনো বিষয়কে অগ্রাধিকার দান করা হবে।"

বিষয়টিতো এখনো চরম পর্যায়ে পৌঁছেনি। রাসূলুল্লাহ (স) এতদূর বলেছেন যে—

تَسْمَعُ وَتُطِعُ وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاَطِعْ۔

"তোমাদের (আমীরের) হুকুম শ্রবণ করা ও মেনে চলা উচিত। এমন কি যদি তোমাদের পৃষ্ঠদেশে আহত করা হয় এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় তবুও।"–মুসলিম ঃ কিতাবুল ইমারত

এটি এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য হাদীস মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয় যে, সবরকমের প্রতিকূলতা ও কষ্ট বরদাশত করেও 'শ্রবণ' ও 'আনুগত্য' থেকে তাদের কোনোক্রমেই দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি আমীর ও খলীফার পদে অধিষ্ঠিত আছেন ততক্ষণ তাঁর আনুগত্য লাভের অধিকার অনস্বীকার্য। তাঁর এ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া মুসলমানদের জন্য ফরয। তাঁর অকর্মণ্যতা, বে-ইনসাফ এবং নিপীড়নও এ অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারে না।

এ অধিকার কত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অস্বীকার করলে মুসলমান কত নিম্নে নেমে যায় নিম্নলিখিত হাদীসগুলো থেকে তা আন্দাজ করা যায় ঃ

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ۔

"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে (তার এ পন্থা অবলম্বনের স্বপক্ষে) তার নিকট কোনো যুক্তি থাকবে না।'

–মুসলিম ঃ কিতাবুল ইমারত

বুঝা গেলো যে, আমীর ও খলীফাগণের নাফরমানীর বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায় না বরং এটি ভবিষ্যতে আল্লাহর নিকটও পেশ করা হবে। সেখানে এর স্বপক্ষে কোনো প্রকার সাফাই পেশ করা যেতে পারে না। মানুষকে সেখানে বাধ্য হয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে হবে।

অন্য একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهٖ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি নিজের আমীরকে কোনো অপসন্দনীয় কাজ করতে দেখে তাকে সবর করা উচিত (এবং এ জন্য তার আনুগত্য বর্জন করার বিষয় চিন্তা না করা উচিত)। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবে, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।"–বুখারী ঃ কিতাবুল ফিতান

এ হাদীসটি যেখানে একদিকে প্রথম হাদীসটি থেকে জ্ঞাত বিষয়টির ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করে সেখানে অন্যদিকে একথাও জানায় যে, এমনটি কেন হয় ? এ ব্যাপারে বক্তব্য হলো এই যে, মুসলমানদের খলীফা হলেন ইসলামী সমাজ ও জাতীয় সংগঠনের প্রতীক। তাই তাঁর আনুগত্য অস্বীকার শুধু এক ব্যক্তির আনুগত্য অস্বীকার করা নয় বরং আসলে তা ঐ সমগ্র সমাজ সংগঠন থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষণাবলী। এটি এমন একটি ভয়াবহ পদক্ষেপ যে, এরপর মুসলমান থাকার দাবীও অর্থহীন হয়ে পড়ে। সব রকমের দীনদারী সত্ত্বেও মানুষ তখন এক ধরনের জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। বরং কোনো কোনো হাদীস থেকে মনে হয় যে, সে সম্ভবত পুরোপুরি জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। কাজেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِدرَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُرَاجِعَ-

"যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায় সে নিজের গলা থেকে ইসলামের শৃংখল খুলে দূরে নিক্ষেপ করে, তবে যদি সে আবার জামাআতের দিকে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা।"

–মিশকাত, তিরমিযীর উদ্ধৃতি থেকে

২. **ভালোবাসা ঃ** আমীরকে ভালোবাসাও খেলাফতের একটি অধিকার। বাইরে যেমন তাঁর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় তেমনি অন্তরেও তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ يَحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ-

"তারাই তোমাদের ভাল খলীফা যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো ও তোমাদেরকে তারা ভালোবাসে এবং যাদের জন্য তোমরা রহমতের

www.pathagar.com

দোয়া করো ও তোমাদের জন্য তারা দোয়া করে। অনুরূপভাবে তারাই তোমাদের মন্দ খলীফা যাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ করো ও তারাও তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ বর্ষণ করো ও তোমাদের প্রতিও তারা অভিশাপ বর্ষণ করে।"–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

'তারাই ভাল খলীফা' অর্থাৎ খলীফাকে এমনই হওয়া উচিত। মানুষ তার জন্য সদিচ্ছা পোষণ করবে, অন্তর থেকে তার কল্যাণ কামনা করবে। মানুষের দৃষ্টি থেকে তার জন্য ভক্তি ভালোবাসা উপচে পড়বে। তাই আর একটি হাদীসে এ আচরণকে দীনদারীর প্রত্যক্ষ দাবী গণ্য করা হয়েছে ঃ

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা। আমরা (অর্থাৎ সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য ? বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলমানদের খলীফা ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য।"–মুসলিম

এ কারণেই খেলাফতের বাইআতকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের প্রকাশ বলা হয়নি বরং 'হৃদয় সম্পদ দান করা' বলা হয়েছে।

مَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهٖ وَثَمَرَةَ قَلْبِهٖ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ ـ

"যে ব্যক্তি খলীফার হাতে বাইআত করলো, সে তাঁর হস্তে নিজের হস্ত সোপর্দ করলো এবং নিজের হৃদয় সম্পদ তাঁকে দান করলো। নিজের সামর্থ মোতাবেক তার খলীফার আনুগত্য করা উচিত।"

–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

অর্থাৎ মুসলমানদের খলীফার হাতে বাইআত শুধু আনুগত্যের শপথই নয় বরং আন্তরিকতা ও ভালোবাসারও শপথ।

৩. দীন ও আখেরাতের জন্য বাইআত ঃ খেলাফতের তৃতীয় অধিকার হলো এই যে, তাকে দুনিয়ার নয় বরং দীনের প্রয়োজন মনে করতে হবে এবং খলীফার হাতে যে বাইআত করা হবে তার পিছনে আসলে প্রেরণা হবে কেবল আখেরাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..... وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا ـ

www.pathagar.com

"তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা (অসন্তুষ্টির কারণে) কথা বলবেন না। ..... এক ব্যক্তি হলো, যে কেবল মাত্র দুনিয়ার স্বার্থে খলীফার হাতে বাইয়াত করে।"

–বুখারী ঃ ২য় খণ্ড কিতাবুল আহকাম

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, কেবল মুসলমানদের খলীফার বাইআত ও আনুগত্য অস্বীকার করাই মুসলমানের জন্য অবৈধ ও ধ্বংসকর নয় বরং নিছক দুনিয়ার স্বার্থে অনুষ্ঠিত তথাকথিত বাইআত ও আনুগত্যও এ একই পর্যায়ভুক্ত। একথা ঠিক যে, দুনিয়ায় সাধারণত সরকারের প্রতি আনুগত্য এ ধরনেরই হয়ে থাকে এবং এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারটি অনেকটা ভিন্নতর। অন্যান্য সরকার যে বস্তুটিকে তাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা মনে করে ইসলামের দৃষ্টিতে আসলে তার কোনো মূল্যই নেই। তার মতে এ আনুগত্য ও বাইআত একমাত্র তখনই মূল্যবান ও কার্যকরী হবে যখন তা দীনের প্রয়োজন মনে করে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

খেলাফত ও মুসলমানদের খলীফাকে যে কারণে এ অস্বাভাবিক অধিকার দান করা হয়েছে পূর্বের আলোচনায় তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। দীন ও আখেরাতের প্রয়োজন মনে করে বাইআত অনুষ্ঠান করা খেলাফতের অধিকার। কারণ মূলত এরই মাধ্যমে খেলাফতের মর্যাদা রক্ষিত হয়। কাজেই সুস্পষ্ট প্রমাণের আলোকে আমরা দেখেছি যে, খেলাফত একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনী প্রয়োজন এবং এর প্রতিষ্ঠা শরীআতের দৃষ্টিতে ফরয। বলাবাহুল্য যে, মর্যাদাটি মূলত একটি দীনী প্রয়োজন, তাকে দীনী মর্যাদা হিসেবে স্বীকার করে নেয়াই তার সত্যিকার স্বীকৃতি হতে পারে। অন্যথায় তার স্বীকৃতি হবে একটি প্রকাশ্য প্রতারণা। যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর আসল মর্যাদা স্বীকার করে না সে যদি তাকে স্বীকার করে বলে দাবী করে, তাহলে কে তার দাবীকে যথার্থ বলতে পারে ? ভালোবাসা ও আনুগত্য খেলাফতের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। দীনের জন্য যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যেটি পুরোপুরি একটি শরীআত প্রদত্ত মর্যাদা, স্বভাবতই মুসলমান তাকে ভক্তি ও ভালোবাসার দৃষ্টিতেই দেখবে এবং কার্যত আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করবে। এটিই হবে তার ঈমানের দাবী এবং এরই মধ্যে তার দীনী প্রেরণা পরিপূর্ণতা অনুভব করবে। বিশেষ করে আনুগত্য হবে তার দীন ও ঈমানের প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট দাবী। কেননা আনুগত্য ছাড়া খেলাফতের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে মানুষ আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে না, সেখানে কোনো

www.pathagar.com

সরকার ও কর্তৃত্বের কি অর্থই বা থাকতে পারে। মানুষ যদি আনুগত্য করতে না চায়, তাহলে কার্যত এটিই রাষ্ট্রব্যবস্থার মৃত্যুর সুস্পষ্ট ঘোষণা। এজন্যই দেখা যায় যে, খলীফাদের প্রতি অনুগত থাকার ওপর এত বেশি জোর দেয়া হয়েছে এবং এ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজের শক্তি নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন কি এটি তখনো কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে যখন প্রজাদের পৃষ্ঠদেশে ঘনঘন আঘাত হানা হয়। আর আনুগত্যের এ অধিকারকে তখনো চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না, যখন ধন-প্রাণের কোনো নিরাপত্তাও থাকে না। ইসলামী সংবিধানে এ ধারাটি সন্নিবেশিত করার কারণ হলো এই যে, মুসলমানদের খলীফার আনুগত্যের বিষয়টি আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপার নয় বরং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের ও দীনের সামষ্টিক ব্যবস্থার দায়িত্বের ব্যাপার। তাই খলীফার ব্যক্তিত্ব যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক এবং তিনি যতই অকর্মণ্য হোন না কেন, যতক্ষণ তিনি খেলাফতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ততক্ষণ তাঁর কর্তৃত্বের সাথেই কার্যত এ ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্পর্কিত। তাঁরই ওপর দীনের বিরাট অংশের অনুসৃতি নির্ভরশীল এবং তাঁকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবন ইসলামী জীবনে পরিণত হতে পারে না। অন্য কথায়, এ পৃথিবীতে তিনি আসলে আল্লাহ তাআলার বিধিবদ্ধ কর্তৃত্বের সক্রিয় প্রকাশ এবং তাঁর কর্তৃত্বের বাহ্যিক নিশানী। মুসলমান নিসন্দেহে সবকিছু বরদাশত করতে পারে কিন্তু এ 'প্রকাশ' ও 'নিশানী'কে নিশ্চিহ্ন হতে দেখতে পারে না। মুসলমান ইসলামের স্বগৃহে শান্তি লাভ না করলেও তা বরদাশত করে নেবে কিন্তু ইসলামের এ গৃহ বিধ্বস্ত হবে এবং দীনের সামষ্টিক ব্যবস্থা থেকে সে বঞ্চিত থাকবে, এটিকে সে কখনো বরদাশত করবে না। আর যদি কেউ তা বরদাশত করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, তার ঈমানের নাভি ছিন্ন হয়ে গেছে। কেননা সে নিজের পার্থিব স্বার্থকে দীনী ব্যবস্থার স্থায়িত্বের ওপর প্রকাশ্যে অগ্রাধিকার দান করছে। এটি এমন একটি কথা, যা কখনো ঈমান ও ইসলামের সাথে একত্রিত হতে পারে না।

আনুগত্যের পরিসীমা

ইসলামে কর্তৃত্বশালীদের আনুগত্যের ওপর এতবেশি জোর দেয়া হয়েছে যে, এ আনুগত্য অবশ্যি অস্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবার দাবী জানায়। কিন্তু সর্বাবস্থায় তা জরুরি নয়। বরং এটি বিশেষ সীমা পেরিয়ে যাবার পর তার অস্বীকার জরুরি হয়ে পড়ে। কেননা একজন মুসলমান তার আমীরের আনুগত্যের প্রশ্নে বহু কিছু বরদাশত করে।

www.pathagar.com

সামষ্টিক জীবনে যে ব্যবস্থাটির ওপর তার মুসলমান থাকা নির্ভরশীল, তাকে যথাসম্ভব সকল প্রকার আঘাত থেকে রক্ষা করাই হয় এর মূল লক্ষ। কিন্তু খোদানাখাস্তা যদি এমন কোনো আনুগত্য অর্থাৎ এমন কোনো কথা নিছক বরদাশত করা নয় বরং সম্পাদন করার দাবী হয়ে থাকে, যার ফলে এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যি তা বর্জনীয়। কাজেই শরীআত যেমন সুস্পষ্টভাবে ও জোরের সাথে আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে ঠিক তেমনি সুস্পষ্টভাবে ও জোরের সাথে এও বলেছে যে, এ আনুগত্য মোটেই শর্তহীন নয় বরং নিশ্চিতরূপে শর্তসাপেক্ষে এবং একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে এটি সম্পাদিত হওয়া উচিত। শরীআত এ 'শর্ত' ও 'সীমানা' নির্ধারণ করেছে নেতিবাচক দিক থেকে 'মা'সিয়াত' (নাফরমানি) শব্দের মাধ্যমে ও ইতিবাচক দিক থেকে 'মা'রুফ' (সৎকাজ) শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে ঃ

لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ۔

"আল্লাহর 'নাফরমানী'র কাজে কারোর আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য হবে একমাত্র 'সৎকাজের' ক্ষেত্রে।"–মুসলিম

অর্থাৎ আনুগত্যের শর্ত হলো এই যে, তা কোনো 'সৎকাজের' হুকুম হতে হবে, 'নাফরমানী'র হুকুমকে অবশ্যি প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং তা সম্পাদন নয় বরং অসম্পাদনই জরুরি হবে। এটি ঠিক 'সৎকাজের' নির্দেশ পালন করার ন্যায় জরুরি। ইমাম নববী বলেন ঃ

اجمع العلماء على وجوبها فى غَير معصية وعلى تحريمها فى معصية ۔

"আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, এমন কোনো কাজ যা গোনাহ্ নয় তাতে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদের আনুগত্য ওয়াজিব এবং নাফরমানীর কাজে তাদের আনুগত্য হারাম।"

–শারহে মুসলিম, ২য় খণ্ড ঃ কিতাবুল আওতার

নাফরমানীর কাজে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদের আনুগত্য কতদূর নিষিদ্ধ ও কোন্ পর্যায়ের হারাম একটি ঘটনা থেকে তা আন্দাজ করা যাবে ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এক আনসার সাহাবীর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। নিয়মমাফিক তিনি সৈন্যদেরকে সেনানায়কের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। সফরকালে সেনানায়ক একবার কোনো কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। কাঠ সংগ্রহ শেষ হবার পর তিনি তাতে অগ্নি সংযোগ করার হুকুম দেন। অগ্নিসংযোগ করার পর সবাইকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

'রাসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে আমার কথা মেনে চলার ও আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি ?' সবাই বলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যি নির্দেশ দিয়েছেন।' একথা শুনে তিনি বলেন, 'তাহলে তোমরা এ আগুনে লাফিয়ে পড়ো।' লোকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকেন। কিছু লোক এ নির্দেশ পালন করতে উদ্যত হন, কিন্তু অন্যেরা তাদেরকে এ বলে নিরস্ত করেন যে, "তোমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ছুটে এসেছিলে (তাহলে নিজেরাই বা আবার তার মধ্যে কেমন করে লাফিয়ে পড়তে পারো ?)" যাহোক কিছুক্ষণ এ ধরনের আলোচনা, বিতর্ক ও ইতস্তত ভাব বিদ্যমান থাকে। ইত্যবসরে সেনানায়কের ক্রোধও প্রশমিত হয় এবং আগুনও নিভে যায়! অতপর নিজেদের অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা এ ঘটনাটি বিবৃত করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এ ঘটনা শুনে যারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলেন তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "যদি তোমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তাতেই পুড়তে থাকতে।"

–মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, কিতাবুল ইমারত

এ ঘটনা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বিবৃতি থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর নাফরমানী তখনো হারাম যখন কোনো আমীরের নির্দেশে তা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঠিক সেই পর্যায়েরই হারাম যেমন অন্য কোনো সময় হারাম হতে পারে। আমীরের আনুগত্যের নীতি তখন তাকে কোনোক্রমেই ক্ষমাযোগ্য কাজে পরিণত করতে পারে না।

যে 'সৎকাজে' আমীরের আনুগত্য অপরিহার্য, তার ব্যাপকতা কতটুকু ? উপরোক্ত হাদীস ও আরো বিভিন্ন হাদীসে আনুগত্যের নেতিবাচক দিক বর্ণনা করার জন্য যে 'নাফরমানী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যেই এ জবাব নিহিত। বলা হয়েছে যে, নাফরমানীর কাজে কারোর আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল 'সৎকাজে'। কাজেই এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যেসব নির্দেশ পালন করলে আল্লাহর নাফরমানী হয় না সে সমস্তই 'সৎকাজের' মধ্যে শামিল এবং সেগুলো পালন করা অপরিহার্য। অর্থাৎ বিশ্বজাহানের পরিচালন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয় বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক মতের অবকাশ রয়েছে, সেগুলো 'সৎকাজের' সীমানার মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে আমীরের নির্দেশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এক ব্যক্তি যত কঠোর বিরোধী মত পোষণ এবং নিজের মতের নির্ভুলতা সম্পর্কে যতই গভীর নিশ্চিন্ততা অনুভব করুক না কেন, তাকে ঐ নির্দেশগুলো স্বীকার করতেই হবে। এটি তার

www.pathagar.com

শরীআত নির্ধারিত কর্তব্য। কেননা এ ধরনের প্রত্যেকটি নির্দেশ সৎকাজের নির্দেশ বলে পরিগণিত হয় আর সৎকাজে আমীরের আনুগত্য মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। নিজের মতের যথার্থতা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির মনে যে নিশ্চিন্ততা থাকে, তা নির্ভুল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তার মত ঠিক হতে পারে, কিন্তু এ সত্ত্বেও আমীরের বিরুদ্ধে অদূরদর্শিতা ও অযোগ্য পরিচালনার অভিযোগ উত্থাপন করে সে আমীরের আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে না। তার নিজের রুচি ও জ্ঞান, নিজের দূরদর্শিতা ও মতের নির্ভুলতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস এবং অন্য কোনো বিষয় তাকে এ অস্বীকারের অধিকার দান করতে পারে না। এ অধিকার একমাত্র সে তখনই লাভ করতে পারে যখন সৎকাজের পরিবর্তে আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দান করা হয়। এ অবস্থায় আমীরের আনুগত্য অস্বীকার শুধু তার অধিকারই নয় বরং কর্তব্যে পরিণত হবে।

খলীফার পদচ্যুতি

খলীফা বা আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে শরীআতের এ বিভিন্ন নির্দেশ অধ্যয়ন করার পর মনে অবশ্যি প্রশ্ন জাগবে, কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদের সম্ভাব্য অকর্মণ্যতা ও যুলুমের পরিণাম কি শুধু এতটুকুই, যা ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে অথবা এছাড়া আরো কিছু আছে ? শরীআতের নির্দেশ কি শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যে, যদি এসব লোক যুলুম ও বর্বর আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে ধৈর্যসহকারে তা বরদাশত করে যেতে হবে এবং শুধু নাফরমানীর হুকুম দিলে তা পালন করা যাবে না ; কিন্তু অবশিষ্ট যাবতীয় ব্যাপারে তাদের আনুগত্য তবুও অস্বীকার করা যাবে না অথবা এরপর শরীআত আরো কিছু বলেছে ? আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, অকর্মণ্যতা ও যুলুমের কোনো সীমান্তে প্রবেশ করার পর কর্তৃত্ব ও খেলাফতের অধিকার শেষ হয়ে যায় কিনা ? এবং চিন্তা ও কর্মের এমন কোনো বিকৃতি আছে কি যাতে নিমজ্জিত হলে তা খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ?

শরীআত এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দিয়েছে। এ জবাব বুঝতে হলে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রথমে নীতিগতভাবে একথা বিশ্লেষণ করতে হবে যে, খলীফাদের চিন্তা ও কর্মে কোন্ কোন্ ধরনের বিকৃতি সৃষ্টি হতে পারে ? এ বিশ্লেষণ করার পরই যেসব অবস্থার কারণে কোনো ব্যক্তি খেলাফতের অধিকার হারায় তা সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এ বিশ্লেষণের জন্য গভীর অনুসন্ধানের আশ্রয় নিলে জানা যাবে যে, চিন্তা ও কর্মের বিকৃতি নিম্নলিখিত ছয়টি ধরনের হতে পারে ঃ

www.pathagar.com

১. আমীর যদি প্রজার অধিকার আদায় না করেন এবং তাদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালান।

২. তিনি জনপদকে আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ দেন।

৩. তিনি যদি অসচ্চরিত্র হন, প্রকাশ্যে শরীআতের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং অন্যায় ও গর্হিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকেন।

৪. তিনি যদি দীনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভিত্তিসমূহ ও প্রয়োজনীয় চিহ্নসমূহ অর্থাৎ ইসলামের আরকান আদায় না করেন।

৫. ইসলাম থেকে তাঁর দূরত্ব যদি এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তিনি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ও আইনেও পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলীর অনুপ্রবেশ ঘটান।

৬. তিনি যদি ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহও পরিহার করেন এবং কুফরী আকীদা গ্রহণ করেন।

প্রথম দুই ধরনের বিকৃতি সম্পর্কে শরীআতের নির্দেশ ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দোষ দুটি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট আমীরের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না এবং 'সৎকাজে' তাঁর আনুগত্য অবশ্যি অব্যাহত রাখতে হবে।

তৃতীয় ধরনের বিকৃতি সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ আমীরের অন্যায় ও গর্হিত কার্যাবলীতে প্রত্যেকটি মুসলমান ভীষণ অসন্তুষ্ট থাকবে এবং অসন্তুষ্ট থাকা জরুরি, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে এবং কোনোক্রমেই তা অস্বীকার করতে পারবে না। এবং সৎকাজে তাঁর অনুগত্য পরিহার করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

..... اَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاَهُ يَاْتِىْ شَيْئًا مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَاْتِىْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ۔

"..... জেনে রাখো! যাদের ওপর কোনো শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে তারা যদি ঐ শাসককে নাফরমানীর কাজ করতে দেখে তাহলে তার কার্যাবলীর বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা উচিত কিন্তু (এ সাথে তাঁর) আনুগত্য পরিহার করা উচিত নয়।"

–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

www.pathagar.com

এ বিষয়ে আলেম সমাজ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, অন্যায় ও গর্হিত কাজ করলে খলীফাকে পদচ্যুত করা যায় না এবং নিছক অন্যায় বা গর্হিত আচরণের কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত নয় বরং হারাম।

–শারহে মুসলিম লিন নববী, কিতাবুল ইমারত

এবার চতুর্থ ধরনের বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আমীরের মধ্যে এ ধরনের বিকৃতি দেখা দিলে মুসলমানরা তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করবে ? এরপরও কি তারা ঐ আমীরের খেলাফত ও নেতৃত্ব মেনে চলবে এবং সৎকাজে অবশ্যি তাঁর আনুগত্য করবে অথবা অন্য কোনো পথ গ্রহণ করবে ? নিম্নলিখিত হাদীসগুলোয় এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ঃ

يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمُ الْأُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ ..... قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَمَا صَلَّوْا ـ

"তোমাদের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হবে। তাদের অনেক কথা তোমাদের পসন্দ হবে ও ভাল লাগবে আবার অনেক কথা তোমাদের পসন্দ হবে না এবং খারাপ লাগবে। .... (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! তাহলে এমন অবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না ? রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন, যতক্ষণ তারা নামায পড়বে ততক্ষণ এমনটি করো না।"–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

... وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ .... قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ ـ

".....তোমাদের মন্দ খলীফা হবেন তারাই যাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ করো এবং তাঁরা তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন ..... জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে এমন খলীফাদেরকে কি আমরা তলোয়ারের সাহায্যে জবাব দেবো না ? বললেন, না যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে ততক্ষণ এমনটি করো না।"–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

এ হাদীসগুলো থেকে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নামাযের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামায পরিহার করে সে মুসলমানদের কোনো ছোট বা বড় শাসকের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং তার নেতৃত্ব, খেলাফত বা ইমামত কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। নামাযের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার সাথে সাথেই মুসলমানরা তাকে

www.pathagar.com

পদচ্যুত করার অথবা সে এ পদ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে জনগণ তরবারির সাহায্যে তাকে সরিয়ে দেবার অধিকার লাভ করবে। কাযী ইয়ায বলেন ঃ এ ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে ঃ

اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد الكافر وعلى انه لوطؤ عليه الكافر العزل وكذا لو ترك اقامة الصلوات والدعا اليها ـ

"আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো কাফেরকে খলীফা করা যায় না এবং যদি খলীফা নির্বাচিত হবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কখনো কুফরীর মধ্যে নিপতিত হয়, তাহলে সাথে সাথেই খেলাফত থেকে পদচ্যুত হবে এবং যখন সে নামায কায়েম করা ও অন্যকে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া পরিহার করবে তখনও অনুরূপ ব্যবস্থা হবে।"

–শারহে মুসলিম, লিন্ নববী, ২য় খণ্ড

আমীরের আনুগত্যের প্রশ্নে কুরআন ও সুন্নায় নামায সম্পর্কে যেমন দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ পাওয়া যায় ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভসমূহ সম্পর্কে ঠিক তেমনটি পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন কতিপয় নীতিগত কথা আমরা পাই তা থেকে এ ব্যাপারে পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যেমন হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন ঃ

دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَا فَقَالَ فِيمَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ..... وَعَلٰى اَلَّا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ۔

"রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। বাইআতে তিনি আমাদের নিকট থেকে যেসব কথার অঙ্গীকার নেন তাতে একথাগুলোও শামিল ছিল ঃ আমরা (আমীরগণের নির্দেশ) শুনবো ও (তাদের) আনুগত্য করবো ..... আর শাসনকর্তার রাজ্য শাসনের ব্যাপারে বিবাদ করবো না। তবে একমাত্র তখনই (বিবাদ করবো) যখন আমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরীর চিহ্ন দেখবো—যে কুফরী সম্পর্কে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে।"–বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ফিতান

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, শাসনকর্তা যতক্ষণ না প্রকাশ্যে কুফরীতে নিপতিত হন, ততক্ষণ শরীআত তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ

www.pathagar.com

করার অনুমতি দেয় না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যখনই তিনি "প্রকাশ্য কুফরীতে নিপতিত হবেন, তখনই তাঁর খেলাফতের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। এখানে একটি বিষয় চিন্তা ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ এখানে 'কুফর' শব্দের অর্থ কি ? নিছক কুফরী আকীদা অথবা কুফরী কর্মও কি তার সাথে সংযুক্ত ? এ হাদীসটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করার সময় যদি ইতিপূর্বে নামায প্রসঙ্গে উল্লেখিত হাদীস দুটিও পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দ্বিতীয় কথাটিই যুক্তিসংগত মনে হবে। কেননা ঐ তিনটি হাদীসে একটি বিষয়ই বর্ণনা করা হয়েছে। সে বিষয়টি হলো এই যে, কোন্ অবস্থা সৃষ্টি হবার পর খেলাফতের অধিকার খতম হয়ে যায় ? এ 'অবস্থা' সম্পর্কে প্রথম হাদীস দুটিতে বলা হয়েছে যে, তা নামায পরিহার করার অবস্থা। আর শেষ হাদীসটিতে এজন্য 'প্রকাশ্যে কুফরী' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলাবাহুল্য একই অবস্থা নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার জন্য যখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন তা হয় নিছক আক্ষরিক বিভিন্নতা, অর্থগত বিভিন্নতা নয়। আর যদি কোনো অর্থগত বিভিন্নতা হয়ও তাহলে তা শুধু সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার অথবা একক ও তার ভগ্নাংশের আসল ও মৌলিক বিভিন্নতা নয়। তাই স্বীকার করতে হবে যে, শেষ হাদীসটিতে 'প্রকাশ্য কুফরী' বলতে কুফরী আকীদা ছাড়া কুফরী কর্মকেও বুঝায় না। কোনো একই অবস্থার প্রকাশ ও বর্ণনার জন্য একস্থানে 'নামায পরিহার' ও অন্যস্থানে 'প্রকাশ্য কুফরী' শব্দ ব্যবহার একথাই ঘোষণা করে যে, নামায পরিহার 'প্রকাশ্য কুফরীর রূপান্তর মাত্র' অতপর নামায পড়া যেহেতু একটি কর্ম আকীদা নয়, তাই নামায কায়েম না করাও একটি কর্ম পরিহার, কোনো আকীদা পরিহার নয়। এ অবস্থায় নামায পরিহারকেও প্রকাশ্য কুফরী বলা একথারই সুস্পষ্ট প্রকাশ যে, এখানে কুফরী অর্থ কুফরী কর্মও। সম্ভবত এ কারণেই এ প্রকাশ্য কুফরীর জন্য (الا ان تسمعوا) 'তবে যদি তোমরা শুনো' (الا ان تعلموا) বা 'তবে যদি তোমরা জানো' এর পরিবর্তে (الا ان تروا) 'তবে যদি তোমরা দেখো' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে করে তার মধ্যে কুফরী কর্মের অস্তিত্ব পুরোপুরি প্রকাশ পায়।

এ হাদীসে কুফরী অর্থ 'কুফরী কর্ম' একথা সুস্পষ্ট হবার পর এখন কেবল একটি চিন্তার বিষয় থেকে যায় যে, একমাত্র নামায পরিহার করাকেই কি কুফরী কর্ম বলা যেতে পারে অথবা দীনের অন্যান্য মূল স্তম্ভগুলোর ক্ষেত্রেও এ একই কথা প্রযোজ্য ? এ প্রশ্নের 'হ্যাঁ' ও 'না' দুটি জবাব হতে পারে। 'হ্যাঁ' এজন্য যে, এ কর্ম পরিহার কুরআন ও হাদীসের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতেও কুফরী কর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে এবং হয়েছে। আর 'না' এজন্য যে, নামাযকে যেমন সুস্পষ্টভাবে কুফর ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী এবং নামায ত্যাগ করাকে কুফরী কর্ম বলা হয়েছে, দীনের অন্য কোনো মূল স্তম্ভ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে এতটা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

এবার পঞ্চম ধরনের বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। যে খলীফা ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংরক্ষণ করেন না এবং আইন ও শাসনতন্ত্রে অনৈসলামী বিষয়াবলী সংযোজন করেন, তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত নিম্নলিখিত আয়াত থেকে তার সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফায়লাসা করে না তারা কাফের।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

কুরআন মজীদের এ আয়াতটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে যে, ইসলামী আইন-কানুন পরিহার করে অনৈসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা কুফরী কর্ম। চিন্তা করুন, ইসলামী আইন পরিহার করে অনৈসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা যদি কুফরী কর্ম হয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অথবা তার সমগ্র আইন কানুনের একটি অংশকে অনৈসলামী আইনে রূপায়িত করা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে ; প্রথমটি যদি 'কুফরী কর্ম' হয়ে থাকে তাহলে শেষোক্তটি নিসন্দেহে অপেক্ষাকৃত মারাত্মক কুফরী কর্ম। কুফরী কর্ম খেলাফতের ব্যাপারে কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ তাই এ বিকৃতির গভীরে নিমজ্জিত শাসকের শাসন কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুত করে দূরে নিক্ষেপ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সিদ্ধান্ত শরীআত গ্রহণ করতেই পারে না। কাযী ইয়ায (র) বলেন ঃ

فلو ظئو عليه كفرا وتغيير للشرع او بدعة خرج عن حكم الولايته ـ

وسقطت طاعه ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام

عادل ان امكنهم ذالك ـ

"যদি খলীফা কুফরী কর্মে লিপ্ত হন অথবা শরীআতের নির্দেশাবলী পরিবর্তন করেন অথবা বেদআতের মধ্যে নিমজ্জিত হন, তাহলে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন এবং মুসলমানদের ওপর

www.pathagar.com

থেকে তাঁর আনুগত্য খতম হয়ে যায়। তখন তাকে উৎখাত করার, তাঁকে পদচ্যুত করার ও শক্তি থাকলে তাঁর স্থলে কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়।'–শারহে মুসলিম, লিন নববী, কিতাবুল ইমারত

ইমাম নববী (র) কাযী ইয়ায (র)-এর উল্লেখিত বাক্যাবলী উদ্ধৃত করার পর—এবং এ উদ্ধৃতির অর্থও হলো এই যে, তিনি নিজেও এ মত পোষণ করেন—উল্লেখিত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "لاَمَا صَلُّوْا" এবং "لاَمَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلوٰةَ" -এর অর্থ নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করেন ঃ

فيه معنى ما سبق انه لايجوزا الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم او الفسق مالم يغيروا شيئا من قواعد الاسلام۔

"এখানেও উপরে উল্লেখিত কথাই ব্যক্ত হয়েছে অর্থাৎ খলীফাগণ যতদিন ইসলামের মৌলিক ও নির্ধারিত নির্দেশাবলীতে কোনো প্রকার পরিবর্ধন সাধন করার সাহস করবে না ততদিন নিছক তার যুলুম ও গর্হিত কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয হবে না।"–শারহে মুসলিম, লিন নববী, কিতাবুল ইমারত

এ বাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি কোনো খলীফা ইসলামী আইনকে কোনো পর্যায়ে অনৈসলামী আইনে রূপান্তরিত করেন তাহলে তাঁকে সরিয়ে দেয়া উচিত।

এখন ষষ্ঠ ও সর্বশেষ ধরনের বিকৃতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন হবে। যখন 'কুফরী কর্মই' খেলাফত থেকে পদচ্যুতিকে অপরিহার্য গণ্য করে তখন 'কুফরী আকীদা'র পর তার মধ্যে কোনো চিন্তার অবকাশই বা কেমন করে থাকতে পারে ? ইসলাম ও ঈমান খেলাফতের অধিকারের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও সর্বসম্মত শর্ত। যদি কোনো ব্যক্তি এ শর্ত পূর্ণ করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার খলীফা হবার বা খলীফা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আলেম সমাজ এ মর্মে পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি কুফরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে মুসলমান তাকে কোনোক্রমেই খেলাফতের আসনে সমাসীন দেখতে পারে না।

হাফেয ইবনে হাজার লিখেছেন ঃ

انه يعزل بالكفر اجماعا فيجب على كل مسلم القيام فى ذالك ممن

www.pathagar.com

قوى على ذالك .... فله الثواب ومن داهن فعليه الاثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة تلك الارض-

"কুফরী মতাদর্শ গ্রহণ করার পর খলীফা খেলাফতের অধিকার হারিয়ে বসেন। এ বিষয়ে আলেমগণ একমত। তাই (এরূপ পরিস্থিতিতে) এ কাজের জন্য উঠে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। যে ব্যক্তি নিজের এ দায়িত্ব পালন করবে সে নেকীর অধিকারী হবে। আর যে দুর্বলতা প্রকাশ করবে সে গোনাহগার হবে। আর যে ব্যক্তি (দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ অভিযানে অংশগ্রহণে) অক্ষম তবে তার সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে হিজরত করা উচিত।"

–ফাতহুল বারী, একাদশ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কর্ম ও আকীদার বিকৃতির উপরোল্লিখিত ছয়টি সম্ভাব্য অবস্থানের মধ্যে প্রথম ছয়টিতে খলীফার খেলাফত অধিকার চ্যালেঞ্জ করাকে শরীআত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[১] তবে শেষের তিনটিতে খলীফাকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিয়েছে।

---

১. এ নিষেধাজ্ঞার অর্থ এ নয় যে, খলীফা বা আমীরের প্রতিটি যুলুম, গর্হিত কাজ ও নাফরমানীর নির্দেশকে নীরবে বরদাশত করা হবে। বরং আসল ব্যাপার এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। শরীআত যদিও বৃহৎ গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র গর্হিত কাজকে বরদাশত করার নির্দেশ দিয়েছে তবুও এর সাথে এ নির্দেশও দিয়েছে যে, শাসকগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো মন্দ কাজ অনুষ্ঠিত হলে তাদের সংশোধনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের সামনে সত্যকে পেশ করতে হবে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করতে হবে। ইতিপূর্বে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَعَلَى اَنْ وَالطَّاعَةِ ... হাদীসটি আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসটির অবশিষ্টাংশ হচ্ছে ঃ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰه لَوْمَةَ لاَئِم অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ (স) যেখানে সাহাবীগণের নিকট থেকে খলীফা ও আমীরগণের আনুগত্য ও তাঁদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ না করার বাইআত গ্রহণ করেন সেখানে এ মর্মেও বাইআত করেন যে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন তারা যেন সত্য কথা বলতে পিছপাও না হন।" বাক্য প্রয়োগের এ পদ্ধতি পূর্ব আলোচনায় একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, অন্যায় পথাশ্রয়ী আমীরগণের ব্যাপারে কেবল তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকা, সৎকাজে তাঁদের আনুগত্য অব্যাহত রাখা এবং তাঁদের যুলুম ও গর্হিত কাজে সবর করার পরই মুসলমানদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং এরপরও মুসলমানদের কর্তব্য আছে। যুলুম ও গর্হিত কাজে তাদের সমালোচনা করতে হবে এবং তাঁরা নাফরমানীর নির্দেশ দিলে তাঁদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) ঈমানদারগণকে বারবার বলেছেন যে, সাধারণ লোকদেরকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেমন মুসলমানদের কর্তব্য অনুরূপভাবে আমীর ও শাসকগণের ভ্রান্ত ও শরীআত বিরোধী কার্যাবলীর সমালোচনা করা এবং এতটুকু সাহস না থাকলে অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা মু'মিন হবার অপরিহার্য দাবী।

www.pathagar.com

এ তিন ধরনের বিকৃতিতে ইমামের পদচ্যুতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে কেন? একথা সম্ভবত আলোচনা ও যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যেমন উপরে বিবৃত হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের লক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা নয় বরং এটি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষে পৌছার নিছক একটি অপরিহার্য উপায় মাত্র। আর এ লক্ষ ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও শরীআতের আইন প্রবর্তনের বিষয়টি প্রাথমিক ও মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। এখন এ রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক যদি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে তার নিকট সাধারণ শাসন-শৃংখলা পরিচালনার আশা অবশ্যি করা যেতে পারে; কিন্তু ইসলাম নিজের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিষয়টিকে মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ গণ্য করে তাকে অর্জন করার জন্য সে নিজের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, চিন্তা, কার্যকর শক্তি ও পদাধিকার নিয়োগ করবে, এ আশা স্বপ্নেরও অতীত। বিপরীত পক্ষে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, সে তার সমগ্র শক্তি এর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। এজন্য তার হাত থেকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া নিসন্দেহে ইসলামের উদ্দেশ্যের অনুকূল হবে। প্রায় এ একই ধরনের পরিস্থিতির অবশিষ্ট দুটি অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে বরং একদিক থেকে এতদূর সরে গিয়েছে যে, দীনের সর্বাধিক কার্যকরী ভিত্তিসমূহের সাথেও কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখে না এবং শরীআতের আইন-কানুনসমূহ বাতিল করতেও দ্বিধাবোধ করে না সে যে আন্তরিকতার সাথে খেলাফতের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল থাকবে, এ আর কোনোক্রমেই করা যেতে পারে না। হতে পারে সে দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে বিপুল সম্পদশালী ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব দানের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে, কিন্তু সে দেশকে আল্লাহর বন্দেগী ও সৎবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করবে এবং দেশের সাধারণ মানুষ তার নেতৃত্বে নামায প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত দানকারী, সৎকাজের নির্দেশ দানকারী ও অসৎকাজ থেকে বিরতকারীতে পরিণত হবে, এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যেতে পারে যে, এহেন ব্যক্তিদেরকে নিজেদের সামগ্রিক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দান করার অর্থ হচ্ছে চোর ও ডাকাতদের ওপর নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা।

পদচ্যুতির ব্যাপারে তমদ্দুনিক ক্রমবিকাশের প্রভাব

রাষ্ট্রের শাসনকর্তাকে কখন ও কিভাবে পদচ্যুত করা যায় ? এটি সুস্পষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক শাসন-শৃংখলা সম্পর্কিত ব্যাপার। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক নিয়ম-পদ্ধতি এমন থাকে যেগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে তমদ্দুনিক অবস্থাও অনেকাংশে সক্রিয়। তাই হামেশা একই অবস্থার

www.pathagar.com

ওপর টিকে থাকে না। যতদিন দেশের তমদ্দুনিক অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে ততদিন তার রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাদাসিদে ধরনের হয় এবং এ ব্যবস্থার নীতি নিয়মের পরিসরও হয় অনেকটা সীমিত। অতপর তমদ্দুন যতই সামনে অগ্রসর হয় ততই জীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় রাজনীতির নিয়ম-পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নানাবিধ নীতি-নিয়মের অনুসারী হয়ে অধিকতর ব্যাপক, সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত হয়।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন দীন ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। তাই আন্দোলন ও বৃদ্ধি তার স্বভাবজাত। তমদ্দুনিক ক্রমবিকাশে সে কেবল সাহায্য করতে চায় না বরং তার পথ প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে চায়। কেননা এটি তার নির্ধারিত দায়িত্বের মধ্যে শামিল। ইসলামের এ যোগ্যতা ও মর্যাদা কালের পরিবর্তনশীল অবস্থা ও তমদ্দুনের সম্প্রসারণশীল প্রয়োজনসমূহকে সর্বদা দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখতে চায়। সে তার নিজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম ও পদ্ধতিসমূহকে নতুন রূপ ও নতুন আকার দান করে। তাই যুগের সংগৃহীত সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী এ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করলে তা কোনো বিদআতের পর্যায়ে পড়বে না বরং সুন্নাতের অনুকূল হবে, তা ইসলামের সীমা অতিক্রম করার পর্যায়ে পড়বে না বরং ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষের অনুসারী হবে।

খলীফাদের পদচ্যুতির বিষয়টি এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। কেননা কোনো খলীফাকে কতদিন খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত রাখা উচিত এবং কোন্ সময় ও কিভাবে তাকে সরিয়ে দেয়া উচিত—এ বিষয়টি পুরোপুরি রাজনৈতিক নিয়ম শৃংখলার সাথে সম্পৃক্ত। এ রাজনৈতিক নিয়ম শৃংখলা নির্ধারণের ব্যাপারে তমদ্দুনিক অবস্থা ও যুগের চাহিদা সক্রিয় থাকে এবং এগুলো দীনী ব্যবস্থার মূলনীতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। এগুলোর মধ্যে যে কখনো কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করা যাবে না এমন কোনো কথা নেই। আজ দুনিয়ার তমদ্দুনিক ও সামাজিক অবস্থা যেহেতু বারো তেরো শ' বছর পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে ও অধিকতর সামনে অগ্রসর হয়েছে এবং সরকার পরিবর্তনের বিষয়টিও যথেষ্ট সহজ হয়ে গেছে তাই বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ খলীফার পদচ্যুতি কি আজো কেবল উপরোল্লিখিত তিনটি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ? অথবা বিকৃতির অবশিষ্ট তিনটি পর্যায়ের কোনো একটিতেও এ পথ গ্রহণ করা যেতে পারে ? এ প্রশ্নের জবাবটি অন্য একটি প্রশ্নের জবাবের উপর নির্ভরশীল। তাহলো এই যে, জনগণের ধন-প্রাণ সংরক্ষণ

www.pathagar.com

ও তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল কি-না ? এবং শাসকগণের চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও ঈমানী অবস্থায় এবং প্রজা সাধারণের মানসিক গঠন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করে কি-না ? এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যি ইতিবাচক হবে এবং এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো মত হতেই পারে না। এ সত্য উদঘাটিত হবার পর প্রথম প্রশ্নের জবাবও আর অনুক্ত থাকে না। এ জবাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আজ যদি দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রজাদের ওপর যুলুম করছে অথবা গর্হিত ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে অথবা আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম দিচ্ছে, তাহলে বর্তমানে সরকার পরিবর্তনের যে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে তার সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে কর্তৃত্বের আসন থেকে আজও সরিয়ে দেয়া যেতে পারে বরং সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। কেননা এ ধরনের অনিষ্টকারিতায় লিপ্ত হবার পর তার হাতে মানুষের ধন-প্রাণ সংরক্ষিত থাকবে, সে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করবে, তাদের মন-মস্তিষ্ককে অসৎবৃত্তি ও অকর্মণ্যতার গহ্বরে নিক্ষেপ করবে না, ইসলামী রাষ্ট্রের ললাটে কলংক লেপন করবে না এবং এ রাষ্ট্রের যাবতীয় উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূর্ণ হতে থাকবে—তার নিকট থেকে আশা করা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতপর এহেন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে দীন ও মিল্লাতকে সংরক্ষিত রাখার শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খেলাফতের আমানত পূর্ববৎ তার নিকট গচ্ছিত রাখা কেমন করে যুক্তিসংঙ্গত হতে পারে ? খেলাফত ব্যবস্থা অনবরত ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু শরীআত তার অনুসারীদেরকে এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সহজ ও সুস্পষ্ট পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকবে, শরীআত সম্পর্কে কি মুহূর্তকালের জন্যও একথা চিন্তা করা যেতে পারে ?

এ প্রসংগে উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোর শব্দাবলী থেকে কোনো প্রকার জটিলতা বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। ঐ হাদীসগুলো থেকে এ মর্মে সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, যতদিন খলীফা নামায ত্যাগ করবেন না এবং প্রকাশ্য কুফরী করবেন না ততদিন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এ হাদীসগুলো থেকে যথার্থ এ নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু যে কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে গুরুত্ব না দিলে এ হাদীসগুলোর আসল উদ্দেশ্য এবং যালেম ও ফাসেক নেতৃত্ব সম্পর্কে শরীআতের যথার্থ দৃষ্টিভংগি পূর্ণরূপে বোধগম্য হতে পারে না। তাই প্রথমে ঐ কারণটি জানা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (র)-এর এ সুস্পষ্ট বর্ণনাটিই যথেষ্ট বলে মনে হয় ঃ

www.pathagar.com

اجمع اهل السنة انه لايعزل السلطان بالفسق ..... قال العلماء وسبب عدم العزل وتحريم عليه ماتترتب على ذلك من الفتن وارافة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة فى عزله اكثر منها فى بقائه -

"আহলে সুন্নাতগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, শাসকগণকে ফাসেকী ও গর্হিত কাজের জন্য পদচ্যুত করা যায় না। ..... আলেমগণ বলেন, এ পদচ্যুত না করার ও এ ধরনের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম এজন্য যে, এর ফলে ফিতনা-ফাসাদ, রক্তপাত ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শুরু হবে। কেননা পদচ্যুত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হবে তার ফলে সৃষ্ট এসব অনিষ্টকারিতা খলীফার স্বপদে বহাল থাকার অনিষ্টকারিতা থেকে অনেক গুণ বেশি।"–শারহে মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

এ হলো ফাসেক আমীরদের সম্পর্কে আলেমগণের মত। যালেম আমীরদের সম্পর্কেও তাঁরা একই মত প্রকাশ করেছেন। আর সত্যি বলতে কি, ইসলাম সম্পর্কে অবগত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নিষিদ্ধকরণের পক্ষে এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কারণ পেশ করতেই পারেন না। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে একথা স্বীকার করা উচিত যে, যেসব ধরনের বিকৃতিতে আমীরগণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তা কেবলমাত্র শান্তিভংগ, গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের আশংকায় করা হয়েছে। নয়তো এ নিষেধাজ্ঞা কোনোক্রমেই সর্বব্যাপী, সার্বজনীন ও চিরন্তন নয়। অর্থাৎ আসল ব্যাপার হলো এই যে, শরীআতের দৃষ্টিতে এখানে প্রশ্ন ছিল দুটি অপরিহার্য আপদের মধ্যে থেকে একটিকে অবশ্যি গ্রহণ করার। এ দিকে শাসকের যুলুম ও ফাসেকীকে বরদাশত করে নেয়ার প্রশ্ন আর অন্যদিকে শক্তি প্রয়োগ করে এগুলোকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ফলে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের অনিষ্টকারিতায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রশ্ন। শরীআত সুস্থ বিবেক-সম্মতভাবে শেষোক্ত আপদটিকে অধিকতর কঠিন এবং প্রথমোক্তটিকে তুলনামূলকভাবে কম কঠিন গণ্য করেছে। তাই তার নির্দেশ হলো এই যে, শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমোক্তটিকেই বরদাশত করতে হবে এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাষ্ট্রকে নৈরাজ্যের কবলে নিক্ষেপ এবং জনসাধারণকে হত্যা ও লুণ্ঠনের বেদীমূলে বলিদান করার নিকৃষ্টতর বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে 'কুফরী আকীদা'

www.pathagar.com

ও 'কুফরী কর্ম' এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। কেননা আমীরগণের এ ত্রুটি ও গোমরাহী খেলাফতের উদ্দেশ্য ও লক্ষকে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই করে না বরং তাদের গলা টিপে ধরে এবং নিসন্দেহে বলা যায় যে, এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ মুসলমানের রক্তের চেয়ে কম নয় বরং বেশি মূল্যবান। তাই শরীআতের দৃষ্টিতে এ আপদটি অধিকতর কঠিন এবং এর তুলনায় অশান্তি ও রক্তপাতের আপদ কম কঠিন গণ্য হয়েছে। এর স্বাভাবিক দাবী এই ছিল যে, 'কুফরী আকীদা' ও 'কুফরী কর্মের' প্রকাশের সাথে সাথেই শরীআত শাসকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে।

.....একথা যখন আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, যালেম ও ফাসেক আমীরগণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল কেবল মাত্র গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে বাঁচার জন্য—তখন আমাদেরকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যেখানে কার্যত এ আপদ সৃষ্টির আশংকা নেই সেখানে এ নিষেধাজ্ঞাও অনুপস্থিত থাকবে। আর যদি হাঙ্গামা ও রক্তপাত ছাড়া সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে, তাহলে এমন অবস্থায় যালেম ও ফাসেক নেতৃবর্গকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা কোনোক্রমেই উচিত হবে না। তখন বিবেক ও শরিআত উভয়ের একমাত্র দাবী হবে তাদেরকে অবশ্যি তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া। তাই হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেন ঃ

فقال ابن التين عن الداؤدى قال الذى عليه العلماء فى امراء الجودانه ان قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبر -

"ইবনুত তীন দাউদীর এ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, যালেম আমীরগণ সম্পর্কে আলেম সমাজের ফতোয়া হলো ঃ যদি কোনো প্রকার ফিতনা এবং অন্যায় অত্যাচার ছাড়াই তাদেরকে পদচ্যুত করা যায় তাহলে তা করা ওয়াজিব। অন্যথায় সবর করা ওয়াজিব।"

–ফাতহুল বারী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা

অনুরূপভাবে ইমাম নববী (র)-ও অন্যান্য আলেমগণের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে ঃ

واما قوله "اصبروا" فذالك حيث يلزم من ذالك سفك الدماء اوانارة الفتنة ونحو ذالك -

"রাসূলুল্লাহ (স) যে সবর করতে বলেছেন তার সম্পর্ক হচ্ছে এমন অবস্থার সাথে যখন (আমীরের বিরুদ্ধে) ঐ পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে

www.pathagar.com

রক্তপাত বা ফিতনা-ফাসাদ অথবা অনুরূপ কোনো সাধারণ আপদ সৃষ্টির আশংকা থাকে।"–মুসলিম, কিতাবুল ঈমান

মোটকথা যালেম ও ফাসেক আমীরগণের পদচ্যুতি সম্পর্কে এটিই আলেম সমাজের সাধারণ মত। নিসন্দেহে আজ থেকে হাজার বছর পূর্বের কথাই বা কেন, এ নিকট অতীতেও সাধারণ পরিস্থিতি এমন ছিল যার ফলে বলপ্রয়োগে সরকার পরিবর্তন মোটেই সহজ কাজ ছিল না। বরং সেকালে এ ধরনের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা দেশের শান্তি শৃংখলাকে সমূলে ধ্বংস করার নামান্তর ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (স) যালেম ও ফাসেক শাসনকর্তাদের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই সবর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যদি অনুরূপ পরিস্থিতির অবসান ঘটে থাকে, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, ঐ নির্দেশের স্থান-কালের অবসান ঘটেছে। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বর্তমান কালে ভোটের সাহায্যে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার, অতপর প্রয়োজন হলে তাঁকে পদচ্যুত করার যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে তার সাহায্য গ্রহণ করা যথার্থই ইসলামী পদ্ধতি ও দীনের দাবী অনুযায়ী হবে। যেখানেই এ পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ থাকবে সেখানে মুসলমানদের অবশ্যি তার সদ্ব্যবহার করার জন্য অগ্রসর হতে হবে। যখনই তাদের আমীর খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে অপারগ হবেন তখনই তাঁকে পদচ্যুত করে তদস্থলে কোনো যোগ্যতর ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে। কেননা এ পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনে কোনো প্রকার ফিতনা-ফাসাদ, দাংগা-হাংগামা ও রক্তপাতের আশংকা নেই। অন্য কথায় এখানে যালেম ও ফাসেক শাসককে বরদাশত করার আপদ অথবা গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের আপদ—এ দুটির মধ্য থেকে কোনো একটি আপদকে অবশ্যি গ্রহণ করার প্রশ্নই নেই। কাজেই এখানে রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের মোকাবিলায় যালেম শাসকদের অস্তিত্ব বরদাশত করার প্রশ্নই ওঠে না।

আবার প্রয়োজন এতটুকুই নয় যে, খলীফা কোনো ভুল করলে তবেই তাঁকে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি দান করতে হবে বরং যদি তিনি কোনো ভুল না করে থাকেন, যদি তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার যুলুম বা ফাসেকী কার্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবুও এ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ধারা অব্যাহত থাকা বা না থাকা সম্পর্কে একটি যুক্তিসংগত সময় পরপর জনগণের মতামত গ্রহণ করা উচিত। কেননা হতে পারে বর্তমান আমীর কোনো উল্লেখযোগ্য ভুল করেননি, যার ফলে তাঁকে পদচ্যুত করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কিন্তু ইত্যবসরে জাতির মধ্যে এমন কোনো

www.pathagar.com

ব্যক্তির উদ্ভব হতে পারে যার ওপর জাতি তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভর করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, বর্তমান আমীরের পরিবর্তে ঐ নতুন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান করা হলে তিনি অধিকতর যোগ্যতার সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। এ অবস্থায় সরকার পরিবর্তন না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না এবং যেহেতু এক ব্যক্তিকে পূর্বেই এ পদের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাজেই অন্য কোনো ব্যক্তির উন্নততর যোগ্যতা দ্বারা লাভবান হওয়া যাবে না, এটা কোনোক্রমেই যুক্তিসংগত হতে পারে না। কেননা এখানে খেলাফত এবং খেলাফতের উদ্দেশ্য ও দায়িত্বই একমাত্র গুরুত্বের অধিকারী। কোনো ব্যক্তি বা তার কোনো অধিকারের কোনোই গুরুত্ব নেই। অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, ইসলামে সরকার ও কর্তৃত্ব আসলে নিছক একটি দায়িত্ব অধিকার নয়। তাই যদি কোনো ব্যক্তিকে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাঁর কোনো অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হলো না যে, তিনি এজন্য অভিযোগ করবেন। বরং তাঁর ওপর থেকে একটি দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে নেয়া হলো এবং তাও কেবল শরীআতের উদ্দেশ্যে ও খেলাফতের লক্ষের তাগিদে।

খেলাফত ব্যবস্থার ঐক্য

যেহেতু খেলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজন, গুরুত্ব ও ধরন সবকিছুই আসলে দীনকেন্দ্রিক বরং পুরোপুরি দীনকেন্দ্রিক বলাই অধিকতর সংগত হবে। তাই মুসলিম জনবসতির (দারুল ইসলাম) পরিসীমা যতই ব্যাপক হোক না কেন সমস্ত মুসলমানের খলীফা ও ইমাম হবেন মাত্র একজন এবং বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক রাষ্ট্র ও খেলাফত কায়েম করা যাবে না।

আল্লামা মাওয়ারদী বলেন ঃ

لايجوز ان يكون الامة امامين فى وقت واحد -

"একই সময়ে মুসলিম জাতির খলীফা হবেন দু'জন, এটা কোনোক্রমেই জায়েয নয়।"–আল আহকামুস সুলতানিয়া, ৭ম পৃষ্ঠা

এ ব্যাপারে দু-একজন ছাড়া সমগ্র জাতি একই মত পোষণ করে।

ইমাম নববীর ভাষায় ঃ

اتفق العلماء على انه لايجوز ان يعقد لخليفتين فى عصر واحد سواء التسعت دار الاسلام ام لا -

www.pathagar.com

"আলেমগণ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দারুল ইসলামের পরিসীমা যতই ব্যাপক বা সংকীর্ণ হোক না কেন, একই যুগে সেখানে দু ব্যক্তির খেলাফত প্রতিষ্ঠা জায়েয নয়।

–শারহে মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত

শরীআত এ নীতিটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেছে। একজন খলীফা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় যে ব্যক্তির হাতে খেলাফতের বিকল্প বাইআত গ্রহণ করা হয় শরীআতের দৃষ্টিতে সে প্রাণদণ্ড লাভের যোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (স) পরিষ্কার বলেছেন ঃ

اِذَا بُوْيِعَ لِلْخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْاٰخَرَ مِنْهُمَا۔

"যদি দু ব্যক্তির হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয় তাহলে তাদের মধ্য হতে শেষোক্ত জনকে হত্যা করো (যদি তা) তথাকথিত খেলাফতের ফিতনা কোনোক্রমেই নির্মূল না হয়।"–মুসলিম, কিতাবুল ইমারত

সারকথা হলো এই যে, ঐক্য ইসলামী রাজনীতির একটি স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ইসলাম জাতির জন্য একই সময়ে একাধিক সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বের অত্যন্ত কঠোরভাবে বিরোধিতা করে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, তাকে এমনটি করা উচিত ছিল। কেননা এটি ছিল তার প্রবৃত্তির দাবী, তার মিশন ও তার খেলাফত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বিশ্ব রাজনীতির আকাশে স্বগৌরবে বিরাজ করার অথবা তাদের উন্নত মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ দানের অথবা তাদের বিভিন্ন দেশীয় ও গোত্রীয় দলের নিজেদের জাতীয় 'অহং'-এর ঝাণ্ডা বুলন্দ করার খায়েশ পূর্ণ করার জন্য খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেয়নি বরং ইসলাম এ নির্দেশ এজন্য দিয়েছে যে, এভাবে সে নিজে শাসকের স্থান অধিকার করে থাকবে, মানব জীবনে তার আইন প্রতিষ্ঠিত হবে, তার দাওয়াত ও তার কর্ম দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পরিব্যপ্ত হতে পারবে, তার ও তার অনুসারী জাতি শত্রু থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্বের সীমানা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হতে থাকবে। এ অবস্থায় সমগ্র মুসলিম জাতি যদি একটি জাতি ও একটি রাজনৈতিক একক হবার পরিবর্তে একাধিক রাজনৈতিক এককে বিভক্ত হয় এবং এভাবে সমগ্র দারুল ইসলাম কার্যত বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকারে পরিবর্তিত হয়, তাহলে তা হবে ইসলামের শক্তিমত্তার নয় বরং তার দুর্বলতার প্রতীক। এটি হবে জাতির গ্রন্থীসমূহের একত্র

www.pathagar.com

থাকার বিরোধী। এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহর রজ্জু ছাড়া আরো কিছু সম্পর্ক আছে, যা তার পরিবেশে ঐক্য ও সমন্বয়ের কেন্দ্রবস্তুতে পরিণত হতে চায় এবং বর্তমানে এ জাতির মধ্যে ভিতর থেকে ফাটল ধরেছে, তাই সে এক দেহ ও এক প্রাণ হয়ে কুফরী ও গোমরাহীর মুকাবিলা করতে পারবে না। বলাবাহুল্য যে উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ পরিস্থিতি তাকে অস্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই ইসলাম সমগ্র মুসলিম জাহানের একটি রাষ্ট্র হবার পরিবর্তে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের 'কমনওয়েলথে' পরিণত হবার অনুমতি দেয় না। বরং এর বিপরীতে সে একই দাওয়াত ও কর্মের নিশানবরদার জাতিকে রাজনৈতিক পর্যায়েও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত রাখতে চায়।

অবশ্যি এ প্রশ্ন স্বতন্ত্র যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমগ্র জাতির একই জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকার সাংগঠনিক রূপ কি হবে ? অর্থাৎ তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইউনিট্যারি পদ্ধতি হবে, না ফেডারেল পদ্ধতি ? এ ব্যাপারে বলা যায়, দীনের সাধারণ রুচি-প্রকৃতি, তার সামগ্রিক নির্দেশাবলীর গতি, খেলাফতের উদ্দেশ্যাবলী এবং ইসলামের প্রথম যুগের কর্মপদ্ধতি—এসব কিছুই ইউনিট্যারি পদ্ধতির সরকারের পক্ষে তাদের চূড়ান্ত মত ব্যক্ত করে। কিন্তু এ সঙ্গে আর একটি বিষয়কে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না, তাহলো এই যে, এ 'চূড়ান্ত মতের' সম্পর্ক অবশ্যি এমন একটি পরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত যখন সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ভৌগলিক দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হবে। এবং তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকবে মুসলমানদের নিজেদের হাতে অথবা ভৌগলিক দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও একই রাষ্ট্রীয় শাসন সংবিধানের আওতায় থাকার ব্যাপারে তাদেরকে কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সমগ্র মুসলিম এলাকা যদি ভৌগলিক দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত না হয় বরং তাদের মধ্যে যদি এমন অমুসলিম রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব থাকে যে, এ ইসলামী দেশগুলোকে কার্যত একটি ইউনিট্যারি পদ্ধতির রাষ্ট্রের আওতায় থাকার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা সমগ্র এলাকা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মাঝখানে কতিপয় এলাকা অমুসলিমদের পদানত থাকে এবং এ কারণে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম এলাকাসমূহ ভৌগলিক দিক দিয়ে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে এ 'চূড়ান্ত মতের' ওপর জোর দেয়া যায়। কেবল বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে নয় বরং শরীআতের কতিপয় নির্দেশও এ ব্যাপারে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। আবদুল

www.pathagar.com

কায়েস গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলে, "হে রাসূল! আমাদের ও আপনাদের দেশের মাঝে মুদার-এর কাফেররা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাই আমরা আপনার খেদমতে হাযির হয়ে ইসলামী বিধিবিধান লাভ করতে পারি না। কেবল যে সকল মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ সেই মাস ক'টিতে আমরা এ সুযোগ লাভ করতে পারি। তাই আপনি আমাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দান করুন। আমরা সেগুলো কার্যকরী করবো ও দেশে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে এদিকে আহ্বান করবো।" রাসূলুল্লাহ (স) এ প্রতিনিধি দলের আবেদনে যা বলেন এবং তাদেরকে যেসব বিষয়ের নির্দেশ দেন তার মধ্যে একটি ছিল ঃ

وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ -

"তোমরা যে 'গনীমতের মাল' লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ (ইসলামী রাষ্ট্রকে) প্রদান করতে থাকো।"

—মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড

চিন্তা করুন, এ নির্দেশের পিছনে কোন্ প্রকার ধারণা কাজ করছিল ? নিশ্চয় সেখানে এ ধারণা ছিল যে, আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা মুদার গোত্রের কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেদের সামর্থানুযায়ী জিহাদ করতে সক্ষম এবং এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল থেকে তাদেরকে যথাসময়ে নির্দেশ দেয়া সম্ভব ছিল না। অথচ যে কোনো ইউনিট্যারি পদ্ধতির রাষ্ট্রের কোনো এক এলাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ লাভ করার পরই কোনো প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতি করতে পারে। এজন্য আবদুল কায়েস গোত্রকে তিনি স্বেচ্ছাকৃত ও স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধপ্রস্তুতি করার যে অনুমতি দান করেন তা থেকে একথাই বুঝা যায় যে, পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে ইসলামী রাষ্ট্র ইউনিট্যারি পদ্ধতির পরিবর্তে ফেডারেল পদ্ধতি ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। কেননা উল্লেখিত গোত্রকে রাসূলুল্লাহ (স) যে ধরনের ক্ষমতা—এবং তাও আবার যুদ্ধ ও সন্ধির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দান করেন, তা ফেডারেল পদ্ধতির আওতায় কোনো প্রাদেশিক রাষ্ট্র যে ধরনের ক্ষমতা লাভ করে তা থেকে কোনো অংশে কম নয়।

এ আলোচনার সারকথা হলো এই যে, আসল ও উন্নত পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো ইউনিট্যারি পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থা, কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেতে পারে।

❐

www.pathagar.com

জাতীয় নৈরাজ্যে দীনী দায়িত্ব

সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজন

মুসলিম জাতির জন্য একটি সুসংবদ্ধ সমাজ জীবনের যতটুকু ও যে পরিমাণ প্রয়োজন আগের অলোচনায় তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু এ দুনিয়ায় কোনো দলও চিরকাল নিজের ইপ্সিত অবস্থায় বিরাজিত থাকেনি। তাই এ জাতিও একদিন ভিন্নতর অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে। কেননা সে নিজের প্রয়োজনীয় সামাজিক কাঠামো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দলের পরিবর্তে এখন সে বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিবর্গের একটি জনতায় পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে কোনো সামাজিক বন্ধন নেই, কোনো সামগ্রিক আন্দোলন নেই। যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বুকে সে অস্তিত্ব লাভ করেছিল কার্যত তার সে উদ্দেশ্যও এখন অনুপস্থিত। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে তার এ অবস্থা নিতান্ত অপসন্দনীয় বরং অসহ্য, একথা বলাবাহুল্য বৈ আর কিছুই নয়। কেননা এ অবস্থাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু মুসলিম জাতিকে এ অবস্থায় কি করা উচিত, এক্ষেত্রে একথা মোটেই সুস্পষ্ট নয়। তাই যুক্তি ও বাস্তব অবস্থা উভয় দিক দিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির নির্ভুল জবাব অবগত হতে হবে।

প্রথমে এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক জবাব নির্ধারণ করুন ঃ

উপরের সমগ্র আলোচনা আমাদের সামনে আছে। এ আলোচনায় আমরা দেখি, ইসলাম স্বভাবতই একটি অকৃত্রিম, সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ সমাজ চায় এবং কার্যত তার জন্য এটি অপরিহার্য। এ ছাড়া মুসলমানরা সত্যিকার মুসলিম জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না এবং ইসলামও মানব জাতিকে তার অভীষ্ট সম্পদ দান করতে সক্ষম হয় না। তাই মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সাথে যে অসংখ্য বিধি-বিধানের সম্পর্ক তা কেবল লিখন-পঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, বাস্তব জগতে সেগুলোর প্রবর্তন ও সেগুলোকে মেনে চলার উপযোগী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে না। এসব কিছু আমরা সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের আলোকে অবলোকন করেছি। এখন চিন্তা করুন, এক্ষেত্রে বুদ্ধি বৃত্তির দাবী কি হতে পারে ? তার দাবী হবে এ জাতিকে বিক্ষিপ্ত জনতা থেকে 'দলে' পরিণত করার এবং এমন দলে পরিণত করার যার মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য থাকবে, যার সর্বদেহ একই রঙে রঞ্জিত ও একইভাবে

www.pathagar.com

আন্দোলিত হবে, যাকে 'আল জামাআত' বলা সম্ভব হবে এবং যে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। নিঃসন্দেহে বুদ্ধির দাবী ও ফায়সালা এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

অতপর শরীআত এ প্রশ্নের যে জবাব দেয় তাই হবে এর আসল জবাব। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আল্লাহর কিতাব থেকে আমরা নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী পাই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

"হে ঈমানদারগণ! ..... আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং পৃথক পৃথক হয়ে থেকো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২-১০৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ

"হে ঈমানদারগণ! (আল্লাহ ও রাসূলের) আনুগত্যে তোমরা পূর্ণরূপে প্রবেশ করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে প্রথম আয়াতটির উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এখান থেকে সরাসরি এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, সমগ্র মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল থাকা উচিত এবং আল্লাহর রজ্জু যেন তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে রাখে। দ্বিতীয় আয়াতটি থেকেও পরোক্ষভাবে ঐ একই কর্তব্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। কেননা, প্রত্যেকটি মুসলমান যখন নিজেকে আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ শর্তহীন আনুগত্যে সোপর্দ করবে তখন এরপরও জাতির বিশৃংখল ও সংগঠনহীন অবস্থায় থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। সমগ্র মুসলিম জাতি যদি আল্লাহর দীনের মধ্যে নিজেদের সমগ্র জীবন সোপর্দ করে—যে দীন সুসংগঠিত দলবদ্ধ জীবন-যাপনকারীকে সমাজের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করেছে এবং এজন্য শ্রবণ ও আনুগত্যের বিস্তারিত নির্দেশ দান করেছে—তাহলে অবশ্যি মুসলিম সমাজ ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের রূপ ধারণ করবে। তাই আয়াতের পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ জাতি যদি পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ ও এক রঙে রঞ্জিত না হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যি ঐক্যবদ্ধ ও এক রঙে রঞ্জিত হতে হবে।

এ নির্দেশাবলী সাধারণ ও সার্বজনীন। কোনো বিশেষ অবস্থা, বিশেষ সময় অথবা বিশেষ স্থান ও পরিবেশের সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয়। যখন ও যেখানেই মুসলমানদের কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দল থাকবে, তাদের প্রতি এ নির্দেশাবলী কার্যকরী হবে। তাদের জন্য এ নির্দেশাবলী শ্রবণ ও সমর্থন অনুযায়ী এর আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এ আয়াতগুলোর মধ্যে

www.pathagar.com

এমন কোনো সামান্য ইংগিতও নেই যা থেকে এ মর্মে কোনো ধারণা করা যেতে পারে যে, এ নির্দেশাবলী কেবল সাহাবায়ে কেরামের জন্য ছিল। তাই আল্লাহর এ নির্দেশাবলী প্রথম যুগের মুসলমানদের ওপর, যখন মুসলিম জাতি 'হাবলুল্লাহ' এর বন্ধনে পূর্ণরূপে আবদ্ধ ছিল এবং এ যুগের মুসলমানদের ওপর, যখন এ বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, সমানভাবে প্রযোজ্য। বরং সত্য বলতে কি, এ নির্দেশাবলী যতটুকু গুরুত্ব ও কঠোরতার সাথে সেই ঐক্য ও শৃঙ্খলার যুগের মুসলমানদের ওপর প্রযোজ্য ছিল ঠিক ততটুকু বরং তার চেয়ে কিছুটা বেশি গুরুত্ব ও কঠোরতার সাথে এ বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাজ্যকর যুগের মুসলমানদের ওপর প্রযোজ্য। কেননা তাদের জন্য এ নির্দেশাবলীর কার্যকরীরূপ ও গুরুত্ব আসলে একটি সতর্কবাণীর চেয়ে কিছুটা অধিক ছিল ; আর এদের জন্য এগুলো নির্দেশ ও অসিয়তের চেয়েও অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। সুস্থ-সবল ব্যক্তির তুলনায় একজন দুর্বল চলৎশক্তিহীন রোগীর জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি মেনে চলা কয়েক গুণ বেশি জরুরি। আল্লাহর বাণীর পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, জাতীয় বিরোধ ও অরাজক অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি বলেন ঃ

مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدُ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَاعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ۔

"আমার পর যারা জীবিত থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। সে সময় আমার 'সুন্নাত'কে এবং আমার নির্দেশাবলীর অনুগত ও সত্যের অনুসারী খলীফাদের 'সুন্নাত'কে শক্ত করে আকড়ে ধরা ও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা তোমাদের জন্য অপরিহার্য।"

–আবু দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, কিতাবুস সুন্নাহ

এটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও মৌলিক নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশটি প্রত্যেকটি মুসলমানের সমগ্র সত্তাকে নাড়া দিয়ে বলে যে, জাতির মধ্যে যদি কখনো কোনো প্রকারের বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে তোমরা 'রাসূলুল্লাহর সুন্নাত' ও 'খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের' ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। এছাড়া অন্য কোনো পথ তোমাদের জন্য যথার্থ ঈমানদারীর পথ হবে না।

এ হাদীসে উল্লেখিত 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ কি ? এ কথাটিই প্রথমে যথার্থরূপে অনুধাবন করা উচিত। ফিকাহর পরিভাষায় এ শব্দটির যে

www.pathagar.com

সীমিত অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং যেটি সাধারণভাবে পরিচিত এখানে এর অর্থ ঠিক তা নয়। সংশ্লিষ্ট হাদীসের শব্দাবলীই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হাদীসে কেবল 'আলাইকুম বিসুন্নাতী' বলেই শেষ করে দেয়া হয়নি বরং এরপর বলা হয়েছে, "ওয়া সুন্নাতিল খোলাফায়ির রাশেদীনাল মাহদিয়্যীন।' অর্থাৎ বিরোধের সময় 'সুন্নাতে রাসূল'-এর সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত'কেও দাঁত দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য ফিকাহর পরিভাষায় যে জিনিসটিকে সুন্নাত বলা হয়, তা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সাথেই সম্পৃক্ত, খোলাফায়ে রাশেদীন বা কোনো সাহাবীর কথা, কর্ম ও ইজতিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সাথে আসলে তা সম্পৃক্ত নয়। তাই আভিধানিক দিক দিয়ে সুন্নাতের যে ব্যাপক অর্থ হওয়া উচিত সেই অর্থই এখানে গৃহীত হবে। অর্থাৎ সুন্নাত অর্থ হচ্ছে পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী। বিভিন্ন হাদীসে এ শব্দটির এ অর্থই গৃহীত হয়েছে এবং সত্যি বলতে কি, রাসূলুল্লাহ (স) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ 'রাসূল' হিসেবে ও খোলাফায়ে রাশেদীন 'খোলাফায়ে রাশেদীন' হিসেবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু করেছেন তা সবই তাঁদের সুন্নাত। সেগুলোর সম্পর্ক ইবাদাত, সামাজিক বিষয়াবলী, তমদ্দুনিক পদ্ধতি এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ব্যাপকতর সমস্যাবলীর সাথে থাকতে পারে।

এ আলোচনার আলোকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর অর্থ এ দাঁড়াবে যে, দীনের প্রতি আনুগত্য, তার প্রতিষ্ঠা ও তার যাবতীয় দাবী পূরণের ক্ষেত্রে আমি যা কিছু করছি এবং আমার পর আমার আনুগত্যের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীন যা কিছু করবেন, তোমাদের তাই করা উচিত। বিশেষ করে যখন জাতির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে তখন এ বিষয়টির প্রয়োজন আরো বেড়ে যাবে।

চিন্তা করা উচিত, সমাজ বন্ধন থেকে বঞ্চিত থাকলে জাতি কোন্ অবস্থায় পৌঁছে যায় ? এটি কি বিরোধের অবস্থা নয় ? নিসন্দেহে এটি কেবল বিরোধের অবস্থা নয় বরং তা থেকে অনেক বেশি। এটি এমন একটি অবস্থা যে, এর প্রকাশ ও বর্ণনার উপযোগী একমাত্র ব্যবস্থা এ হতে পারে যে, এটি অসংখ্য বিরোধ সৃষ্টির সর্বশেষ ও নিকৃষ্টতম অবস্থা। তাই যদি কোনো একটি বিরোধের প্রকাশের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য হয়, তাহলে

www.pathagar.com

অসংখ্য বিরোধের নিকৃষ্টতম ফলাফল প্রকাশিত হবার পর এ নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিতরূপে অধিকতর অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

তাহলে এখন দেখা উচিত যে, এ ধরনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কি ছিল ? অথবা কমপক্ষে নীতিগতভাবে কি হওয়া সম্ভব ছিল ?

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এ জাতীয় অরাজক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত তাঁর কোনো 'সুন্নাত' ও কর্মপদ্ধতির সন্ধান আমরা পেতে পারি না। কেননা তাঁর মহান যুগে এ ধরনের নিকৃষ্টতম অবস্থা সৃষ্টির কার্যত কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই জাতীয় অরাজকতা ও বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থায় তিনি কি করেছিলেন—তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর সুন্নাত থেকে এ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করাও হবে অর্থহীন। একটি নতুন জাতি গঠন ছিল তাঁর সমস্ত কাজের মূল লক্ষ। তাই জাতীয় অরাজকতার ক্ষেত্রে আমরা যে নেতৃত্ব লাভ করতে পারি তা একমাত্র তাঁরই জীবন ও তাঁর কর্মপদ্ধতি হতে গৃহীত নেতৃত্বই হতে পারে। কাজেই এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে দেখতে হবে তিনি কিভাবে জাতি গঠন করেছিলেন ? অতপর এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে যেভাবে এবং যে কার্য সম্পাদনরত দেখতে পাবো সেখান থেকেই এ জাতির নয়া সংগঠনের জন্য নির্দেশনামা গ্রহণ করবো আর এটিই হবে বিরোধমূলক পরিস্থিতিতে তাঁর সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা। তিনি কিভাবে জাতি গঠন করেছিলেন একথা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক ওয়াকিফহাল ব্যক্তিই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকৃতি দান করে নিজের সামর্থ মুতাবিক নামায-রোযা আদায় করাকে যথেষ্ট গণ্য করেননি বরং তিনি 'ওয়া'তাসিমূ বিহাবলিল্লাহি জামীআও ওয়ালা তাফাররাকূ'-এর যে অর্থ নিজের কর্মের মাধ্যমে ঘোষণা করেন তা এই ছিল যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো তার জীবন স্বতস্ফূর্তভাবে একটি শক্তিশালী সংগঠনের অংশে পরিণত হতো এবং তিনি তাদেরকে তসবিহদানা গ্রোথিত করার ন্যায় সমাজ শৃংখলে গ্রোথিত করতেন। এমন কি মদীনা জীবনের কয়েক বছর পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য স্বদেশ-গৃহ, আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে মদীনায় এসে বসবাস করা জরুরি কর্তব্যের মধ্যে শামিল ছিল। অর্থাৎ কেবল মানসিক দিক দিয়ে এবং বাস্তব পক্ষে তাদের একটি সংঘবদ্ধ দলে পরিণত হওয়া যথেষ্ট ছিল না বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী বাহ্যিক ও শারীরিক দিক দিয়েও তাদের একটি কেন্দ্রে সংঘবদ্ধ হয়ে যাওয়াও দীন ও ঈমানের দাবী ছিল। এ নির্দেশ তিনি

www.pathagar.com

ততক্ষণ প্রত্যক্ষ করেননি যতক্ষণ ইসলাম রাজনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ণ শক্তিশালী হয়নি এবং কুফর ও শিরকের শক্তি তার প্রতিষ্ঠার সাথে যথার্থ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশংকামুক্ত হতে পারেনি। মক্কা বিজয়ের পর যখন এ আকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তখনই তিনি ঘোষণা করেন যে, এখন আর কোনো ব্যক্তির স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় আসার প্রয়োজন নেই ; যে যেখানে আছে সেখানে থেকেই জাতীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্পাদনের সাথে সাথে সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারে لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ "বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই।"

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে একথাই ধারণা করা যেতে পারে যে, যদি তিনি কোনো প্রকার জাতীয় অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নবাদিতার সম্মুখীন হতেন, তাহলে তখন তাঁর 'সুন্নাত'ও এই হতো অর্থাৎ এ অরাজক অবস্থাকে ঐক্য ও সংগঠনে পরিবর্তিত করার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য ও সংগত প্রচেষ্টা থেকে তিনি কখনো বিরত হতেন না। তাই তাঁর এ কর্মপদ্ধতির দাবী হবে এই যে, মুসলিম জাতি যখনই বিরোধ ও অরাজকতার শিকার হবে তখনই তার এ অবস্থাকে অবশ্যি ঐক্য ও সংগঠনে পরিবর্তিত করার গুরুদায়িত্ব তার নিজের ওপর অর্পিত হবে।

'রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত'-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের আলোচনায় আসা যাক। যেহেতু খেলাফত আমলের বিষয়াবলী নবুওয়াত আমলের বিষয়াবলী থেকে স্বাভাবিকভাবে ভিন্ন ছিল এবং সেখানে জাতীয় বিরোধ ও অরাজকতা সৃষ্টি হওয়া কার্যত সম্ভব ছিল এবং তা কতকটা সৃষ্টি হয়েও গিয়েছিল, তাই খোলাফায়ে 'রাশেদীনের সুন্নাত' থেকে আমরা প্রত্যক্ষ পথনির্দেশ পেতে পারি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে প্রথম খলীফা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি কেবল প্রথম খলীফাই নন বরং তাঁরই 'সুন্নাত' থেকে আমরা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পথনির্দেশও লাভ করতে পারি। তাই এ ব্যাপারে তাঁর 'সুন্নাত' পর্যালোচনা অধিকতর সংগত ও উপকারী প্রমাণিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন আরবের কতিপয় মুসলিম গোত্র যাকাত আদায়ের ব্যাপারে খলীফার হুকুম অমান্য করতে উদ্যত হলো। তারা যাকাতের অর্থ-সম্পদ সরকারের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকৃতি জানালে পরিস্থিতি এতই নাজুক ও জটিল পর্যায়ে উপনীত হলো যে, হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ন্যায় "আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে কঠোরতম ব্যক্তি"-ও

www.pathagar.com

(اَشَدَّهُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰه) কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সংগত মনে করছিলেন না। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বিদ্রোহী গোত্রের এ দৃষ্টিভংগি বরদাশত করার ব্যাপারে দীনের মধ্যে কোনো প্রকার অবকাশ খুঁজে পেলেন না এবং তিনি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, যদি তারা উট বাঁধার একটি দড়িও—যা তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিয়ে আসছিলো—আমাকে দিতে অস্বীকার করে তাহলে এজন্য আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।"–মুসলিম

এ ঘোষণা বাণীর প্রতিটি শব্দ যথাযথ পর্যালোচনা করলে একথা জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা) একথা বলছেন না যে, লোকেরা যদি যাকাত দেয়া বন্ধ করে তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো ; বরং তিনি বলেছেন যে, যদি লোকেরা যাকাতের অর্থ-সম্পদ আমার (আমার ইসলামী রাষ্ট্রের) নিকট সোপর্দ করতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। অন্য কথায়, তাঁর মতে লোকেরা যদি স্ব স্ব স্থানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত বের করে ব্যক্তিগতভাবে তা প্রাপকদের নিকট পৌঁছায় কিন্তু সরকারী বায়তুলমালে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের এ পদক্ষেপ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অপরিহার্য ঘোষণা করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবে যে, এটি সুস্পষ্টরূপে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থারই প্রশ্ন ছিল। যাকাত বন্ধকারীদের পদক্ষেপ এ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছিল। আর হযরত আবু বকর (রা)-এর এ যুদ্ধ ঘোষণা ছিল এ ব্যবস্থাকে এ প্রতিবন্ধকতা থেকে সংরক্ষিত রাখার একটি পদক্ষেপ। তাই তাঁর এ পদক্ষেপ থেকে তাঁর 'সুন্নাত' সম্পর্কে একথা জানা গেলো যে, জাতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সৃষ্ট কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা বরদাশত করা যাবে না এবং যে কোনো মূল্যে তার গতিরোধ বা তাকে দূর করা অপরিহার্য প্রয়োজন।

এ ঘটনা সম্পর্কিত অন্য একটি বর্ণনায় আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রা) যখন খলীফা হযরত আবু বকরকে পরামর্শ দিলেন যে, 'হে রাসূলুল্লাহর খলীফা, ঐ লোকগুলোর সাথে মিলেমিশে থাকুন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন' (يا خليفة رسول الله ﷺ تالف الناس وارفق بهم) তখন হযরত আবু বকর (রা) তার জবাবে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করেন ঃ

"হে ওমর! জাহেলিয়াতের যুগে যেখানে তুমি অত্যন্ত কঠোর ছিলে সেখানে এখন ইসলামের আমলে এতো দীনতা ও দুর্বলতার পরিচয়

www.pathagar.com

দিচ্ছো ? অবশ্যি একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, অহী প্রেরণ শেষ হয়ে গেছে এবং আল্লাহর দীন পূর্ণতা লাভ করেছে, কিন্তু তা কি আমার জীবদ্দশায়ই পঙ্গু হয়ে যাবে ?"-মিশকাত ঃ বাবু মানাকেবে আবী বকর

হযরত আবু বকর (রা)-এর এ বাক্যাবলী থেকে আলোচ্য বিষয়ের আর এক দিক থেকে পথনির্দেশ পাওয়া যায়। তাঁর এ বাক্যাবলী একথাই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা করে যে, দীনের দাবীসমূহের মধ্যে থেকে যদি কোনো একটি দাবীও পূরণ করতে অস্বীকার করা হয়, তাহলে তাঁর মতে আসলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে তাকে পঙ্গু করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিম ও মু'মিন কখনো এ পরিস্থিতিকে নিশ্চিন্তে মেনে নিতে পারে না। বরং দীনের এ দাবীকে কার্যকর করা ও তাকে কার্যকরী করানো এবং পরিপূর্ণ দীনকে পঙ্গুত্ব প্রাপ্তির বিপদ থেকে রক্ষা করা সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে পরিণত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যখন দীনকে পঙ্গু করে দেয়া হয় অথবা তাকে পঙ্গু করার প্রচেষ্টা চলে, তখন তাকে তার আসা পরিপূর্ণতার অবস্থায় বিদ্যমান রাখা অথবা সেদিকে ফিরিয়ে নেয়ার যাবতীয় সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে রাসূলের খলীফার সুন্নাত। এখন চিন্তা করা দরকার যে, জাতির মিলনগ্রন্থীসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং "ওয়া' তাসিমূ বিহাবলিল্লাহি জামীয়া'ওঁ ওয়ালা তাফাররাকু"-এর ন্যায় দীনের মৌলিক দাবী বিস্মৃত হওয়া দীনের পঙ্গুত্বপ্রাপ্তির নামান্তর হবে নয় কি ? বলাবাহুল্য এ প্রশ্নের একটি জবাবই হতে পারে। তাহলো এই যে, যদি মাত্র কয়েকটি গোত্র কর্তৃক সরকারকে যাকাত আদায় করার ব্যাপারে অস্বীকার জ্ঞাপন দীনকে পঙ্গু করার নামান্তর হয় তাহলে সমগ্র মুসলিম জাতির ইমামহীন ও সংগঠনহীন হয়ে যাওয়া এবং শরীআতের অসংখ্য বিধানের অচলাবস্থার সম্মুখীন হওয়া অবশ্যি কেবল দীনের পঙ্গুত্ব প্রাপ্তিই নয় বরং তার স্থবিরত্বে পৌছে যাওয়ারই নামান্তর হবে। এ জ্বলন্ত সত্যের উপস্থিতিতে কেবল জাতিকে পুনর্বার গ্রন্থিবদ্ধ করা ও তার হৃত সংঘবদ্ধ জীবন তাকে প্রত্যর্পণ করার মাধ্যমেই হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সুন্নাতের আনুগত্য হতে পারে।

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আর একটি বাণীও প্রণিধানযোগ্য ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ بَدَءَ غَرِيْبًا وَّيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ-

"দীনের যাত্রা শুরু হয়েছিল নিঃসম্বল ও অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে এবং পুনর্বার সে সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। কাজেই আমার পর আমার

www.pathagar.com

সুন্নাতের মধ্যে লোকেরা যে বিকৃতির প্রসার ঘটাবে তখন যেসব নিঃসম্বল ও অসহায় লোক সেগুলো পুনর্বার সংশোধন করবে তাদেরকে মোবারকবাদ।"–তিরমিযী

এ হাদীসে জাতির অনাগত দিনের বিকৃত অবস্থার সংবাদ দিয়ে যেসব লোককে সৌভাগ্যবান ও মোবারকবাদ লাভের যোগ্য বলা হয়েছে, তারা কোন্ গুণাবলীর অধিকারী ? রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত ও পদ্ধতির যে সমস্ত অংশ গাফেল ও অসৎ লোকদের হাতে বিকৃত হবে তারা সেগুলো পুনর্বার সংশোধন করে যথাযথ রূপদান করবে। বলাবাহুল্য রাসূলুল্লাহ (স) নিজের এ বাণীতে কেবল অনাগত দিনের একটি সংবাদই পরিবেশন করেননি বরং একটি নির্দেশও দিয়েছেন। সে নির্দেশটি হলো এই যে, যখন তাঁর 'সুন্নাতে'র কোনো অংশ কোনো প্রকার বিকৃতির সম্মুখীন হয়, তখন তার সংরক্ষণ বা পুনর্বহালের জন্য সচেতন মুসলমানদের সম্ভাব্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পৃথিবীতে জীবন-যাপন করার ও আল্লাহর বান্দা হিসেবে অবস্থান করার যে পদ্ধতি তিনি দান করে গেছেন তার কোনো অংশকেও নির্বিঘ্নে যুগের কবলে নিষ্পেষিত হতে দেয়া ঈমানের মৃত্যুর নামান্তর। আইনের (ফিকাহ) দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব যতই সামান্য হোক না কেন, কিন্তু আল্লাহর বন্দেগী ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যেকটি সুন্নাতই হলো 'সুন্নাত' এবং তাঁর এমন কোনো পদচিহ্ন নেই মু'মিনের দৃষ্টি যার বিলুপ্তি বা বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এখানে আবার সেই প্রশ্নটি দেখা দেয় যে, জাতির মিলনগ্রন্থি ছিন্ন হওয়া এবং এভাবে জীবনক্ষেত্র থেকে শরীআতের অসংখ্য বিধানের অসম্পর্কিত হয়ে যাওয়া কি দীনের কোনো সামান্য বিপর্যয় এবং সুন্নাত ও রাসূলের পদ্ধতির কোনো মামুলি বিকৃতি মাত্র ? নিশ্চয়ই নয়। এ বিকৃতি এত বড় ও এত ভয়াবহ যে, দীন ও রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে এর চেয়ে বড় বিকৃতির ধারণা করা যায় না। তাহলে এ সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ বিকৃতির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর নির্দেশের হক কিভাবে আদায় করা যেতে পারে ? অর্থাৎ তখন যারা যথার্থই ইসলামের অনুসারী হবেন ও যাঁরা দারিদ্রের জন্য মোবারকবাদ লাভ করবেন তাঁদের কাজ কি হবে ? নিসন্দেহে এ প্রশ্নেরও একটিমাত্র জবাব হতে পারে। তাহলো এই যে, জাতির বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মিলনগ্রন্থীকে নতুন করে সংযোজিত করতে হবে এবং তার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহর পর ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্রের নীতির নিরীখে বিচার করলেও এ সম্পর্কে এর থেকে ভিন্নতর কোনো জিনিস পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'শরীআত নির্দেশিত খেলাফত ব্যবস্থা' শিরোনামায় মুসলিম ইমামগণের এ উক্তি উল্লেখিত হয়েছে যে, খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমগ্র জাতি একমত। আল্লামা তাফতাযানী খেলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ শরীআতের অনেক ওয়াজিব কার্য সম্পাদন এরই ওপর নির্ভরশীল। (لَاَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ) এ দুটি সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। এ দুটি সত্য তৃতীয় একটি সত্যকে অপরিহার্য গণ্য করে। তাহলো এই যে, যদি জাতির মধ্যে সমাজবদ্ধতা ও সংগঠন না থাকে তাহলে নিজের মধ্যে সেগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা তার অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা এ সমাজবদ্ধতা ও সংগঠনের ওপরই খেলাফত ও নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। প্রাচীরবিহীন ছাদ নির্মাণ যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সামাজিক সংগঠন ছাড়া খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ নীতি সর্বজন স্বীকৃত যে, যে কার্যটির ওপর কোনো ফরয কার্য সম্পাদন নির্ভরশীল সেটি সম্পাদনও ফরযের পর্যায়ে উপনীত হয়। অনেক দীনী অনুশাসনের কার্যকারিতা একজন ইমাম নিযুক্তির ওপর নির্ভরশীল আর ইমামের নিযুক্তি জাতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রোথিত করার ওপর নির্ভরশীল। এখানে প্রথম বিষয়টির অপরিহার্যতা দ্বিতীয় বিষয়টির অপরিহার্যতার প্রমাণে পরিণত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি অপরিহার্যতার সাথে সাথে তৃতীয় বিষয়টিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপরিহার্য হয়ে গেছে।

সমাজব্যবস্থা সংস্থাপনের পদ্ধতি

এ পর্যায়ে আমাদের সামনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ কার্য সম্পাদনের সঠিক পদ্ধতি কি হবে ? এ জাতি বর্তমানে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জনতার ভীড়ে পরিণত হয়েছে, একে কিভাবে আবার 'আল জামাআত'-এ পরিণত করা যেতে পারে। এ জাতি কিভাবে তার হৃত সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ সমাজ ফিরে পেতে পারে ? এ প্রশ্ন এমনিতেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি একে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত জটিল করে দিয়েছে। কেননা এ প্রশ্নটি যদিও নিতান্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী ছিল এবং চিন্তাশীলদের মনে সর্বদা এ প্রশ্নটি জাগরুক ছিল, তাই এর জবাবও সবসময় চিন্তা করা হয়েছে, কিন্তু এ চিন্তা বিবেচনার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সাধারণভাবে যা কিছু শ্রুত ও দৃষ্ট হয়েছে তা কেবল নিতান্ত অসন্তোষজনক নয় বরং বিরোধ ও বিশৃংখলার জ্বলন্ত উদাহরণও। যার

www.pathagar.com

ফলে বিষয়টির জটিলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ সম্পর্কে আমাদেরকে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

এ চিন্তা বিবেচনা শুরু করার সময় তিনটি মৌলিক ও স্বীকৃত সত্যকে আমাদের মনে উজ্জ্বলতররূপে জাগরুক রাখা উচিত।

এক. মুসলিম জাতির প্রয়োজন—যেমন 'ইসলামের সমাজ দর্শন'-এর আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ..... কোনো নিছক ও শৃংখলা বিহীন সমাজের নয় বরং সে একটি বিশেষ ধরনের সমাজ ও ঐক্যের প্রত্যাশী। তার বন্ধন হবে একমাত্র আল্লাহর রজ্জু, তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হবে সত্যের সাক্ষ্য, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা ও দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, এছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

দুই. সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থার পুনর্বহাল—যেমন একটি দীনী প্রয়োজন অনুরূপভাবে তার পুনর্বহালের পদ্ধতিও দীনভিত্তিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতই এ পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, কোনো সাধারণ মানুষের দর্শন, আদর্শ বা অনৈসলামী আন্দোলনসমূহের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য নয়।

তিন. রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'সুন্নাত' থেকে—যেমন আমরা এ ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভ করতে পারিনি যে, জাতীয় অরাজকতার সময় আমাদের কি করা উচিত, অনুরূপভাবে যা কিছু করতে হবে তাও কিভাবে করা উচিত সে সম্পর্কেও কোনো নির্দেশ সেখান থেকে লাভ করা যেতে পারে না। সেখানে যে কারণ ছিল এখানেও সেই কারণ। অর্থাৎ বর্তমানে জাতির যে বিরোধমূলক অবস্থা সামনে রেখে আমরা আলোচনা করছি তা রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে অবস্থায় কাজ করতে হয়েছিল তা থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর। আমাদের সামনে এমন একটি মুসলিম জাতির সংশোধন ও পুনর্গঠনের সমস্যা বিদ্যমান যা আগে থেকেই বিরাজিত। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে একটি নতুন জাতি গঠনের সমস্যা ছিল। তাই সমাজব্যবস্থা পুনর্বহালের জন্য যদি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি হতে কোনো পথনির্দেশ লাভ করা যেতে পারে তাহলে তা কেবল তাঁর চরিত্র থেকে গৃহীত পথনির্দেশই হতে পারে। আবার বিষয়টি কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর দাবী আরও সুদূরপ্রসারী হয়। উভয় অবস্থার এ পার্থক্যের কারণে—যার উল্লেখ এমাত্র করা হলো—আলোচ্য অবস্থার জন্য যদি নবী চরিত্র থেকে সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু

www.pathagar.com

পথনির্দেশ লাভ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কুরআন মজীদ থেকেও তা লাভ করা যেতে পারে না। এর কারণ হলো কুরআন মজীদের বিশেষ ধরন, যা তাকে নির্ভেজাল তত্ত্বমূলক গ্রন্থসমূহ থেকে পৃথক সত্তা দান করে। তত্ত্বমূলক গ্রন্থসমূহ নিজেদের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সম্ভাব্য বিষয় ও অবস্থাকে এক একটি করে গ্রহণ করে এবং তাদের সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভংগি প্রকাশ করতে থাকে। তারা এ ব্যাপারে খুব কমই মাথা ঘামায়, তারা যাদেরকে সম্বোধন করেছে তাদের জীবনের বাস্তব সমস্যাবলী কি, বরং অনেক সময় তারা নির্দিষ্ট কাউকে সম্বোধনই করে না এবং সম্পূর্ণরূপে কল্পনার জগতে নিজেদের দর্শনের মুক্তা ছড়াতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর গ্রন্থ মানুষের হাত ধরে তাকে কল্যাণের মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিতে এসেছিল। সে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বোধন করেছে। তার একটি নির্ধারিত মিশন আছে। সে যা কিছু বলে কালের প্রয়োজনের তাগিদেই বলে। তাই মুসলিম জাতিকে সমাজ সংগঠনের অস্ত্রে সুসজ্জিত করার ব্যাপারে নির্দেশ দানের সময় যদি সে একটি নয়া জাতি গঠনের প্রশ্নকে সম্মুখে রেখে থাকে এবং পূর্ব থেকে বিরাজিত কোনো বিশৃংখল মুসলিম জাতির চিত্র মানসপটে অংকিত রেখে দ্ব্যর্থহীনভাবে কোনো কথা না বলে থাকে, তাহলে তার এমনটিই করা উচিত ছিল।

এ তিনটি সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত সত্যকে মানসপটে অংকিত রেখে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতির নয়া সংগঠনের নির্ভুল পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে।

কুরআন মজীদ মুসলিম জাতি সংগঠনের সময় তাকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য যে মৌলিক নির্দেশ দিয়েছিল ইতিপূর্বে "ইসলামী সমাজ দর্শন" শিরোনামায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সাথে একথাও জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ঐ সমস্ত নির্দেশ কিভাবে কার্যকরী করেছিলেন ? এখানে সেই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যে, জাতির পুনর্গঠনের ব্যাপারে এ সমস্ত কুরআনী নির্দেশ ও রাসূলের কর্মপদ্ধতির নীতিগত মর্যাদা কি হবে এ ব্যাপারেও নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হবে কি না ? যদি হয় তাহলে কতটুকু ?

এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদেরকে পুনর্বার কুরআন মজীদের এ নির্দেশাবলীর শব্দসমূহ ও বর্ণনাভংগি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ কর্মপদ্ধতির অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে হবে এবং গভীর দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

লক্ষ করতে হবে যে, একটি বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সাধারণ গুণাবলীর অস্তিত্ব আছে কিনা ? অর্থাৎ তারা মূলত সাধারণ ও নীতিগত নির্দেশাবলীর পর্যায়ভুক্ত অথবা বাস্তব ব্যাপারে তার বিরোধী ? এ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা সুস্পষ্টভাবে এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব পাবো। কেননা সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে আমরা এমন কোনো ইংগিত পাই না যা থেকে অনুভব করা যেতে পারে যে, কুরআনের এ নির্দেশাবলী মূলত নবীর মাধ্যমে দেহসৌষ্ঠব লাভকারী একটি নতুন জাতির গঠন ও শৃংখলার সাথেই সম্পর্ক রাখে এবং এছাড়া যদি পূর্ব হতে বিদ্যমান মুসলিম জাতির সংস্কার, সংগঠন ও শৃংখলার প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে সেজন্য অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। বিপরীত দিকে আমরা পরিষ্কার দেখি যে, এ আয়াতসমূহে যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে এমন একটি কথাও নেই যা সর্বস্বীকৃত মৌলিক নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত নয়। এমন কি সেখানে যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, তাও সর্বসাধারণের উপযোগী। এভাবে বলা হয়নি যে, হে নবী! এরই ভিত্তিতে মুসলিম জাতিকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করুন অথবা হে নবীর সহযোগীগণ! এ ছাঁচে নিজেদেরকে ঢালাই ও সংগঠিত করা উচিত। বরং বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথার্থ ভয় করো .... এবং তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো'—এটি কি একথার সুস্পষ্ট নিদর্শন নয় যে, ঈমানদারদেরকে সর্বদা ঐ ছাঁচে নিজেদের সংগঠন করতে হবে ? যে কোনো যুগের ঈমানদার হোক না কেন, যখন সর্বপ্রথম এ জাতি গঠনের কাজ চলছিল তখনকার ঈমানদার হোক বা যখন জাতি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে নয়া সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হবে তখনকার ঈমানদার হোক, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যুক্তিসংগতভাবে বিবেচনা করলেও এ থেকে অন্য কোনো কথা পাওয়া যাবে না। কেননা জাতি গঠনের সময়কার সংগঠনের ব্যাপার হোক বা পরবর্তীকালের সংগঠনের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, একথা স্বীকৃত সত্য। কাজেই উদ্দেশ্য যেখানে এক ও অভিন্ন সেখানে একটির সদস্যদেরকে বাইর থেকে ছাঁটাই করে একত্রিত করা আর অন্যটির সদস্যদেরকে ভেতর থেকে আহ্বান জানানো এ সামান্য পার্থক্যটুকুর জন্য কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোন্ মৌলিক পার্থক্যই বা সূচিত হতে পারে ? তবে ব্যক্তিবর্গের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে এ 'ভেতর' ও 'বাইরের' কারণে অবশ্যি পার্থক্য সূচিত হবে। সেক্ষেত্রে একজন অমুসলিমের তুলনায় একজন আমলহীন আকীদা সর্বস্ব মুসলমানের অধিকার—সে এ শৃংখলা ও সংগঠনের

www.pathagar.com

আহ্বানের বিরোধিতা করলেও অবশ্যি অধিক হবে। উভয়ের মধ্যে এ একটি মাত্র পার্থক্য পাওয়া যায়। স্বকীয় পরিসরে নিসন্দেহে এটি একটি বিরাট পার্থক্য। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, জাতি গঠনের মূলনীতির ওপর তা কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা এ বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্কই দেখা যায় না।

সারকথা হলো এই যে, যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যাক না কেন, জাতি গঠনের নয়া পদ্ধতিও মূলত মুসলিম জাতি গঠন সম্পর্কে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে উল্লেখিত পদ্ধতিরই অনুরূপ হবে। তার মূল কথাগুলো হলো এই ঃ

[১] আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সাধারণ আহ্বানের মাধ্যমে কার্যারম্ভ করতে হবে। জাতির আত্মপরিচয়কে পূর্ণ শক্তিতে তুলে ধরতে হবে। জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, পৃথিবীর বুকে কোন্ কার্য সম্পাদন করার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে যে দীনের সাথে সম্পর্কিত হবার দাবী করে সে দীন তার অনুসারী ব্যক্তিবর্গকে কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী করে এবং সামগ্রিকভাবে তাকে কেমন পবিত্র কার্য সম্পাদনে নিরত দেখতে চায় ? এ 'সাধারণ আহ্বানের জবাবে সাড়া দিয়ে তার যেসব ব্যক্তি সচেতনভাবে অগ্রসর হবে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের রব ও আল্লাহর নির্দেশ হলো তোমাদের নিজেদেরকে তাঁর নিকট সোপর্দ করতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া তোমাদের নিকট গ্রহণীয় আর কিছুই থাকবে না। اِتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ "আল্লাহকে ভয় করো, তাকে ভয় করা উচিত, তোমাদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সেই অবস্থা ছাড়া যখন তোমরা হবে মুসলিম।"—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০২

[২] যেসব লোক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের এ আহ্বানকে চিন্তার ক্ষেত্রে নিশ্চিতচিত্তে গ্রহণ করবে এবং কার্যত নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, নিজেদের যে বিস্মৃত উদ্দেশ্যকে তোমরা পুনর্বার গ্রহণ করছো সেটি একটি বিরাট উদ্দেশ্য ও একটি কঠিন কাজ। তোমরা সবাই একটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে একটি এককে ও একটি ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এ কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা তোমাদের মধ্যে কোনোক্রমেই সৃষ্টি হবে না। তাছাড়া এটি তোমাদের মুসলিম ও মু'মিন হবার স্বাভাবিক

www.pathagar.com

দাবীও। তাই তোমাদের পৃথক পৃথক মু'মিন ও মুত্তাকী হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তোমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে একটি সংগঠিত দলে পরিণত হতে হবে যার সামগ্রিক অস্তিত্ব যথার্থ একজন 'মু'মিন-মুত্তাকী-মুসলিম'-এর অস্তিত্বের নামান্তর। এভাবে যেসব লোক একটি সংগঠিত দলে পরিণত হতে প্রস্তুত হবে আর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে যদি তারা আন্তরিকতা সম্পন্ন হয় তাহলে এজন্য প্রস্তুত না থাকার স্বপক্ষে তাদের কোনো কারণ থাকতে পারে না—তাদেরকে এ সংগঠনের অংশে পরিণতকারী বস্তু 'হাবলুল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লাহর দীন) ও 'ইসলামে প্রবেশ' (অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্য) ছাড়া আর কিছুই হওয়া উচিত নয়। এমন কোনো ব্যক্তিকে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় যাকে অন্য কোনো সম্পর্ক এ সংগঠনের সাথে জুড়ে দিয়েছে—যে সম্পর্কের মূলে সত্যিকার প্রেরণা যুগিয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্য ছাড়া অন্য কোনো বস্তু এবং যার সামনে কেবলমাত্র সৎকাজের আদেশ, সত্যের সাক্ষ্য ও দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেই। وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا "সকলে মিলে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, পরস্পর দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।

৩. যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হবে তার আসল কর্তব্য হবে দুটি। এ কর্তব্য থেকে মুহূর্তকালের জন্যও সে দৃষ্টি ফেরাতে পারবে না এবং একে কেন্দ্র করেই তার যাবতীয় প্রচেষ্টা চলতে থাকবে। কর্তব্য দুটির প্রথমটি হলো এই যে, জাতির অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাতে হবে এবং দ্বিতীয়টি হলো এই যে, সংগঠনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ দুটি বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রথমটির উদ্দেশ্য হলো সংগঠনের ছোট্ট চারা গাছটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে, ও এমন কি অবশেষে একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে এবং জাতির বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ একে একে তার নীচে একত্রিত হবে। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হলো ঃ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং শুধু প্রতিষ্ঠিত থাকবে না বরং অনবরত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমান, তাকওয়া ও ইসলামের শক্তি যেন নিস্তেজ না হয়ে পড়ে এবং অনবরত নতুন জীবনীশক্তি লাভ করতে থাকে। তাদের মধ্যে সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার আসল প্রেরণা যেন কখনো দুর্বল না হয়ে পড়ে এবং অন্য কোনো প্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

www.pathagar.com

নয়া সংগঠনের বাস্তব রূপ

জাতীয় সংগঠনের পদ্ধতি নির্ধারিত হবার পর এ আলোচনা নীতিগত-ভাবে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু কার্যত শেষ হয় না। কেননা এখনো একটি প্রশ্নের সমাধান বাকী থেকে যায়। প্রশ্নটি হলো এই যে, এ নয়া সংগঠনের বাস্তব রূপ কি হবে ? এর কার্য কিভাবে সম্পাদিত হবে ? নবীর উপস্থিতিতে এটি অবশ্যি কোনো সমস্যা হিসেবে বিরাজ করে না। কিন্তু যখন কেবলমাত্র উম্মাতদেরই অস্তিত্ব থাকে, তখন অবশ্যি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়। তবে সংগঠন পদ্ধতির প্রথম নীতিগত বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে, এক্ষেত্রেও সেটিকে কার্যকরী করতে হবে। কেননা সবসময় এ আশা থাকে যে, সমাজে কর্তব্যানুভূতির উন্মেষ ঘটবে এবং কোনো ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার ঘোষণাবাণী শুনাতে বের হবেন। আর আশা করার কথাই বা কেন আজ কাল তো কোনো না কোনো আকারে এমনটি হচ্ছে। কিন্তু তারপর কি হবে? সংগঠন সম্পর্কিত অন্য দুটি নীতিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করা যাবে, সামনে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে ? এ নব জাগ্রত কর্তব্যানুভূতি ও এই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের আহ্বানকারীকে আকাঙ্ক্ষিত সংগঠনের শেষ মঞ্জিলে পৌছাবার প্রোগ্রাম কি হবে ? এ বিষয়টি মোটেই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নয়। তাই এর সঠিক সমাধান কি তা চিন্তা করা উচিত।

বলাবাহুল্য এ সমাধানের জন্য আমাদের কোথাও থেকে নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। যেসব আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা এ পথনির্দেশ পেতে পারি তন্মধ্যে অনেকগুলো এ পুস্তকের প্রথম দিকের আলোচনাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো পুনর্বার পর্যালোচনা করে চিন্তা করা উচিত যে, যে দীনের প্রত্যেকটি কাজ যতদূর সম্ভব পরস্পর মিলেমিশে একজন আমীর বা নেতার নেতৃত্বে সম্পাদন করা জরুরি বা কমপক্ষে পসন্দনীয় গণ্য করে, যে দীন নামাযের ন্যায় একটি বাহ্যত পূর্ণ নির্জনতাপ্রিয় ইবাদাতের জন্য জামাআতের যথাযোগ্য আয়োজন ও একজন ইমামের যথার্থ অনুসরণ ওয়াজিব গণ্য করে, যে দীন যাকাত, হজ্জ ও রোযার মত ইবাদাতসমূহও যথাসম্ভব সমষ্টিগতভাবে আদায় করার নির্দেশ দেয়, যে দীন বনে-জঙ্গলের সফরকারী তিন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন না করা জায়েয মনে করে না—সেই দীন কি কখনো কোনো শৃংখলা ও নেতৃত্ব ছাড়াই জাতীয় সংগঠনের ন্যায় বিরাট কার্য সম্পাদন পসন্দ করতে পারে ?

www.pathagar.com

সংগঠনের এ পদ্ধতি কি তার পূর্বোল্লিখিত নির্দেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল ও তার প্রকৃতির অনুসারী হবে ? সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যি এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দেবে। অবশ্যি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনে আমরা 'জামাআত', 'আমীর', 'সংগঠন,' ও 'আনুগত্য' শব্দসমূহ উচ্চারিত হতে শুনিনি। কিন্তু যদি আমরা মনে করি যে, সেখানে এ শব্দগুলোর অর্থও অনুপস্থিত ছিল, তাহলে তা আমাদের দৃষ্টি বিভ্রাটেরই প্রমাণ হবে। যে মহামানবের (রাসূলে করীম) ওপর তাঁর মহান সাথীরা প্রাণ উৎসর্গ করতেন, এ আকাশের নিচে যিনি ছিলেন তাদের প্রিয়তম সম্পদ, যাঁর সামান্য ইশারাও তাদের জন্য বড় বড় বাদশাহ ও একনায়কের নির্দেশের চেয়ে অধিক পালনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল, তিনি তাঁর সাথীদের সামনে নিজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে আইনের ভাষায় ঘোষণা করার প্রয়োজনই বা কেন অনুভব করবেন ? এবং তাদেরকে আনুগত্যের শপথনামায় স্বাক্ষরই বা করাবেন কেন ? তাই এ সমগ্র যুগে এমন একটি ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যাবে না যা থেকে পরোক্ষভাবেও একথা প্রমাণ হতে পারে যে, সেখানে সমাজ, সংগঠন ও আনুগত্য ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। আবার একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মক্কায়ই ঈমানদারদের জন্য وَاَمْـــرُهُمْ شُـــوْرٰى بَيْنَهُمْ (তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করতো।) আয়াত নাযিল হয়েছিল। যাদের মধ্যে সামগ্রিক ব্যবস্থা বা সংগঠন ছিল না তাদের সম্পর্কে কি এ বাক্য বলা যেতে পারতো ? নিসন্দেহে বলা যায়, ঐতিহাসিক সত্যের ন্যায় কুরআনের এ শব্দাবলীও একথাই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনে 'সংগঠন' ও 'আনুগত্য' শব্দগুলো ব্যবহৃত না হলেও সেখানে অবশ্যি একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল, একটি প্রাণবন্ত সমাজ সেখানে অবশ্যি কর্মতৎপর ছিল, সেখানে অবশ্যি দাওয়াত ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবাই একত্রে বসে পরামর্শ করতেন, চিন্তা ও আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছাড়া কোনো কার্য সম্পাদিত হতো না।

এখানে একটি নীতিগত সত্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। যতদিন এমন সব লোক সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করেন যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনে ঈমানদারগণ ছিলেন এবং যতদিন তাঁদের আহ্বায়ক ও নেতা এমন ব্যক্তি হন যেমন তাঁদের মধ্যকার ব্যক্তি ছিলেন, ততদিন 'জামাআত', 'আমীর', 'শৃংখলা' ও 'আনুগত্য' প্রভৃতি শব্দগুলো উচ্চারণ করার আসলে কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। বরং বলা যায়, যে, তখন এ শব্দগুলো

www.pathagar.com

উচ্চারণ করা ঐ ব্যক্তির মহত্ব, বিরাটত্ব ও জনপ্রিয়তার প্রতি কলঙ্ক লেপন করার নামান্তর এবং তাঁর সাচ্চা অনুসারীদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য কিছুটা অপমানকর। এ শব্দগুলো কেবল তখনই উচ্চারিত হয় যখন এ দুটি কথা বা এদের মধ্য থেকে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে। কাজেই এ কারণেই মক্কায় যেখানে اِعْتَصِمُوْا بِاللّٰه -এর নির্দেশ যথেষ্ট ছিল সেখানে মদীনায় কেবল اللّٰه بِحَبْلِ বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সাথে সাথে وَلَا تَفَرَّقُوْا -এর সুস্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছে।[১] অনুরূপভাবে মক্কী যুগে শব্দের স্থূল অবয়বে শৃংখলা ও আনুগত্যের কোনো উল্লেখ না থাকলেও মাদানী যুগ শুরু হবার সাথে সাথেই اَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ (রাসূলের আনুগত্য করো) বাক্য ব্যবহার করা শুরু হয়। এর কারণ হলো এই যে, প্রথম বস্তুটি মদীনায় অনুপস্থিত ছিল, অর্থাৎ মাদানী যুগের ঈমানদারগণ মক্কী যুগের ন্যায় আন্তরিকতা-সম্পন্ন, প্রাণ উৎসর্গকারী ও আপাদমস্তক আনুগত্যের প্রতিমূর্তি ছিল না। বরং তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক কাঁচা মুসলমান ও মুনাফিকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তাদের ঈমানী দুর্বলতা বা মুনাফেকী স্পৃহা তাদেরকে দীনের দাবীসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য উস্কানী দিতো। তাই এখন মু'মিনদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ দলে পরিণত হবার এবং আল্লাহ, রাসূল ও নেতৃবর্গের আনুগত্য করার জন্য সুস্পষ্টভাষায় নির্দেশ দান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এটি ছিল আহ্বায়ক ও নেতা যখন উন্নত মানের ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন, কিন্তু তাঁর অনুসারীদের প্রত্যেকেই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হন না, তখনকার দৃষ্টান্ত। আর এর বিপরীত অবস্থার দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস ভরপুর। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে যে, যখনই কিছু সংখ্যক মুসলমান কোনো প্রয়োজনবশত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ও নেতৃত্ব থেকে কিছুদিন পৃথক থেকেছে তখনই একজন আমীরের অধীনতা ছাড়া এক পাও অগ্রসর হয়নি। মাদানী যুগে প্রায় প্রতিদিন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হতো এবং যুদ্ধের জন্য সেনাদল পাঠানো হতো, কিন্তু একজন আমীর নিযুক্ত না করে কোনো একটি প্রতিনিধিদল ও সেনাবাহিনীকেও পাঠানো হয়নি। মক্কী যুগে যদিও এ ধরনের অবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টির অবকাশ প্রায় না হবার সমান ছিল কিন্তু কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে

১. اِعْتَصِمُوْا بِاللّٰه বাক্যটি সূরা আল হজ্জে উল্লেখিত হয়েছে। এটি মক্কী সূরা। এবং اِعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰه جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا বাক্যটি সূরা আলে ইমরানের একটি অংশ, আর এ সূরাটি নাযিল হয় মদীনায়।

www.pathagar.com

এজন্য অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা হয়নি। তাই আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় যখন কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে পৃথক হচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত পথে বেরিয়ে পড়েননি বরং সবাই একটি জামাআত গঠন করে একজন নেতার অধীনে হিজরত করেন। মুহাজিরগণের প্রথম কাফেলা দশজন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) এ কাফেলার নেতা নিযুক্ত করেন।–সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড

সারকথা হলো এই যে, মক্কী যুগের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, সেখানে আসলে কোনো সামগ্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল না।

এ আলোচনা থেকে জাতীয় সংগঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে দীনের দাবী ও শরীআতের দৃষ্টিভংগী পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ এবং কুরআন ও সুন্নাতের সমষ্টি সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশাবলী একথাই ব্যক্ত করে যে, জাতীয় সংস্কার ও নয়া সংগঠনের দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে একটি সংগঠন ও একটি নেতৃত্বের অধীনে সম্পর্কিত হওয়া উচিত।

শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার পর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বিচার করলেও এ একই কথা প্রমাণ হবে। দুনিয়ার কোনো সামষ্টিক বিপ্লব কোনো সামগ্রিক ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে এমন কোনো নজির ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বিশাল পৃথিবীতে যে আইন-বিধান কার্যকরী আছে সেও বলে যে, এমনটি কখনো হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে না। তাই কোনো শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া যদি জাতীয় সংগঠনের অভিযান পরিচালিত হয় তাহলে তাও সফলকাম হতে পারবে না। এ ব্যাপারে যেসব ব্যক্তিগত সংস্কার ও শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলবে, তার উদ্দেশ্য হবে শুধু মুসলমানদের এ জংগলে কিছু সংখ্যক আন্তরিকতা সম্পন্ন, দীনদার ও জাতির সামগ্রিক ব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রত্যাশী ব্যক্তি সৃষ্টি করা। এমন লোক 'কিছুসংখ্যক' না হয়ে হয়তো 'অনেক' হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ এ সম্মিলিত ও সামষ্টিক লক্ষে উপনীত হওয়ার প্রেরণা তাদের সবাইকে একই রজ্জুতে শক্ত করে বাঁধবে না এবং এজন্য একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব অনুপস্থিত থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর দীন যা প্রত্যাশা করে এবং হযরত ওমর (রা)-এর ভাষায় যা ছাড়া ইসলাম ইসলামই থাকে না—সেই সমাজ কিয়ামত পর্যন্ত

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেসব আন্তরিকতা সম্পন্ন, দীনদার ও জাতীয় সংগঠন প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গ কোনো সংগঠন ও নেতৃত্বের অধীন নয় তাদেরকে জাতির নয়া সংগঠনের প্রতিভূ মনে করা পাকা ইটকে ওজন ও পরখ করে কোনো সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীর নির্মিত হয়ে গেছে বলে ধারণা করার ন্যায়। নিসন্দেহে এটি বড় অদ্ভূত ব্যাপার হবে যে, মুসলমানদের আর সমস্ত কাজ তো সুশৃংখলভাবে একটি সংগঠন ও নেতৃত্বের অধীনে সম্পাদিত হবে, তাদের দীন তাদের নিকট এরই প্রত্যাশী, কিন্তু যে অভিযানটি জাতিকে একটি শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা ও সংগঠন দান করার জন্য পরিচালিত হয়েছে, একমাত্র সেটিই এ ধরনের সংগঠন ও শৃংখলা বর্জিত হবে। এ পরিস্থিতিতে এ অভিযানটি কি নিজেই নিজের বিরোধী হবে না ? আর তার ব্যর্থতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কি এ কথাটুকু যথেষ্ট হবে না যে, শৃংখলা ও সংগঠন সন্ধানের এ প্রচেষ্টায় সবকিছু আছে, কিন্তু শৃংখলা ও সংগঠনের অস্তিত্ব নেই।

যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, জাতীয় সংগঠনের অবশিষ্ট দুটি নীতিকে কার্যকরী করার জন্য কার্যত এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যে, যেসব লোক সচেতনভাবে এ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে তারা একটি জামাআতি সংগঠন কায়েম করবে এবং নিজেদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে এ সংগঠনের নেতা নির্বাচন করবে যিনি সর্বাধিক সুচারুরূপে এ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করতে পারেন। আবার তার একটি শক্তিশালী পরামর্শ ব্যবস্থা থাকবে। সে ব্যবস্থা যেন وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -এর দাবী পূরণ করে। এভাবে পরিপূর্ণ শৃংখলা ও সংগঠনের মাধ্যমে এ শক্তিশালী ও দীর্ঘ অভিযান অনবরত চলতে থাকবে।

একথা মোটেই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয় যে, এ জামায়াতটি স্বস্থানে 'আল জামায়াত' হবে না এবং এ সংগঠনটিও জাতীয় সংগঠনের পরিপূরক হবে না। বরং তাকে অস্তিত্বদান করাই হবে এর কাজ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের হাতে থাকবে তার লাগাম। নিজের দারিদ্র ও নতুনত্বের মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে, সত্য দীন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদ্ধতির বিকৃতি বা বিরাট দিকটার গঠন ও সংস্কারের কাজে সে সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টার ত্রুটি করবে না।

(اَلَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ)

❐

www.pathagar.com

নির্জন বাস

শরীআতের দৃষ্টিতে নির্জনবাস

একদিকে ঈমান ও ইসলামের জন্য সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের অস্তিত্ব নিতান্ত অপরিহার্য। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআন মজীদের কতিপয় ইশারা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতিপয় সুস্পষ্ট বাণী থেকে জানা যায় যে, সমাজ জীবন থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত নির্জন জীবনও অনৈসলামী জীবন নয়। বরং যথার্থ ইসলামী জীবন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলও এ জীবনের ওপর সন্তুষ্ট। যেমন ঃ সূরা আল কাহ্ফের দ্বিতীয় রুকূ'তে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ আসহাবে কাহ্ফ এমন একদল লোক ছিলেন যারা লোকালয় থেকে দূরে একটি সুরক্ষিত পর্বত গুহায় অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে তারা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকতেন। বলা যেতে পারে যে, অসামাজিক জীবনের এ কর্মকাণ্ডের বিবরণ এমনভাবে দান করেছে যে, তা থেকে তাদের এ পদ্ধতির ওপর কোনো সামান্যতম অসন্তোষও প্রকাশ পায়নি। বিপরীত পক্ষে কুরআন তাকে আল্লাহপরস্তির একটি সম্মানজনক উন্নত নমুনা হিসেবে পেশ করেছে এবং এ গুহাবাসীদেরকে মযবুত ঈমান ও উন্নত সত্য পথাশ্রয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছে ঃ

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى -

"নিসন্দেহে সেই নওজোয়ানরা নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাদেরকে আমি অধিক হেদায়াত দান করেছিলাম।"

–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ১৩

অনুরূপভাবে হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ

(১) قَالَ رَجُلٌ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهٗ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ -

১. "এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম মানুষ কে ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে মুসলমান নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর

www.pathagar.com

পথে জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? জবাব দিলেন ঃ তারপর যে মুসলমান কোনো গিরি গুহায় গিয়ে নির্জনবাসী হয় ও সেখানে নিজের প্রতিপালকের ইবাদাত করতে থাকে এবং মানব সমাজকে তার অনিষ্টকারিতাসহ দূরে রেখে আসে।"

–মুসলিম ঃ বাবু ফাযলিল জিহাদি ওয়ার রিবাত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় يدع الناس من شره - এর স্থলে يعتزل شرور الناس (মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে দূরে সরে আসে) শব্দাবলী উল্লেখিত হয়েছে।–ফাতহুল বারী ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ ৪ পৃষ্ঠা।

(٢) يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالَ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ-

২. "মানুষ শীঘ্রই একযুগে পদার্পণ করবে যখন একজন মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ হবে তার ছাগলের পাল। এ ছাগলের পাল নিয়ে সে পর্বত শিখরে ও পানির স্থলে ঘুরে বেড়াবে, নিজে দীনকে আঁকড়ে ধরে ফিতনা থেকে দূরে পলায়ন করতে থাকবে।"

–বুখারী, বাবু আয়লাতু রাহাতুম মিন খেলাতিস-সূ

এ হাদীসগুলোর আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মু'মিন যদি সমাজ জীবন থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে তা ভুল হবে না বরং একটি ভাল পদ্ধতি হবে।

কর্তব্য নয় সুযোগ

নিসন্দেহে এ ধরনের কথা ও নির্দেশাবলী কুরআন ও হাদীসে আছে এবং যখন কুরআন ও হাদীসে কোনো বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তখন তা অনুরূপ 'ইসলামী' হয় যেমন অন্য কোনো বিষয় হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখানে ইসলামী হবার অর্থ কি ? এর অর্থ কি এই যে, এ নির্জনবাসও পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ? এবং যখনই এ পদ্ধতি গৃহীত হবে তখনই তা ঠিক অনুরূপ পর্যায়ের আদর্শ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় জীবন বলে গণ্য হবে যেমন সুসংগঠিত সমাজ জীবন গণ্য হয়েছে ? অথবা অন্য কিছু ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব নির্ধারণের জন্য আমাদেরকে নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে ঃ

১. মুসলমানদেরকে একটি সুসংগঠিত সমাজে জীবনয়াপনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোন্ পর্যায়ের ?

www.pathagar.com

২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য—এ দুটি বস্তু নির্জনবাসের পদ্ধতিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে ?

৩. কুরআন ও হাদীসের যেসব বাণী থেকে নির্জনবাসের পদ্ধতি ইসলামী বলে প্রমাণ হয়, তাকি সাধারণ ও শর্তহীন নির্দেশের পর্যায়ে পড়ে অথবা আসল ব্যাপার এর বিরোধী ?

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, ইসলামও সমাজ জীবনের প্রত্যাশী বরং প্রমাণ হয় যে, আসলে ইসলাম একমাত্র সমাজ জীবনের প্রত্যাশা করে। সে শুধু একথাই বলে না যে, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (অবশ্যি সমাজ জীবন যাপন করো) বরং একথাও বলে যে, اِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ (বিচ্ছিন্নতা ও পৃথক জীবন থেকে পরিপূর্ণভাবে দূরে থাকো) এবং এও বলে যে, اِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ (দল ছাড়া ছাগলই নেকড়ের আহারে পরিণত হয়।) এর অর্থ এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, শরীআত সমাজ জীবন যাপনের যে নির্দেশ দিয়েছে তা পালন করা ঐচ্ছিক নয় বরং বাধ্যতামূলক বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ নির্জনবাসের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এবং মুসলিম জাতির অস্তিত্বই তার স্থায়িত্ব বিরোধী। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন মজীদ বলেছে যে, তাহলো আল্লাহর খেলাফত ও তাঁর ইবাদাত প্রতিষ্ঠা। নির্জনবাসও যদি সংগঠিত সমাজ জীবনের ন্যায় পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে এই যে, এ জীবন যাপন করা কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যায় হবে না। প্রত্যেক মুসলমান এ জীবন যাপন করতে পারে, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ জীবন যাপনের জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে বরং নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কমপক্ষে যুক্তিসংগতভাবে এমন একটি অবস্থার ধারণা করা যেতে পরে অথবা এমন একটি অবস্থা প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত হতে পারে যখন সমস্ত মুসলমান নির্জনবাসী হয়ে পড়বে। কিন্তু এ পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে স্বস্থানে তা যতই প্রিয় হোক না কেন, একথা একেবারেই নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার উপস্থিতিতে সে উদ্দেশ্য কোনোদিন পূর্ণ হতে পারে না। কেননা এমন অবস্থায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কার্যত কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না এবং তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য

www.pathagar.com

যেভাবে পালন করা উচিত প্রকাশ্যে কোথাও সেভাবে পালিত হবে না। অনুরূপভাবে মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো 'সৎকাজের আদেশ করা,' 'সত্যের সাক্ষ্য দেয়া' ও 'দীনকে প্রতিষ্ঠা করা'। কে বলতে পারে, জাতি যদি নির্জনবাসী হয়ে পড়ে তাহলে কোনো সময়েও সে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হবে ? যেখানে কোনো সমাজের অস্তিত্বই অনুপস্থিত সেখানে সৎকাজের আদেশের কতটুকুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে? সেখানে সত্যের সাক্ষ্য কিভাবে প্রদান করা যাবে ? সেখানে আল্লাহর দীন কোথায় ও কোন্ বক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে ?

এখন যে সমস্ত হাদীস ও কুরআনের ইশারা থেকে নির্জনবাস শরীআতের বিধানের অনুকূল বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। প্রথম হাদীসটিতে যাতে কোনো পর্বত গুহায় গিয়ে নির্জনবাসী হওয়াকে ও নিজের প্রতিপালকের ইবাদাতে মশগুল থাকাকে উন্নত শ্রেণীর মু'মিনের নিশানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে আরো দুটি কথাও আছে। এক, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে জিহাদকারী মু'মিন ও কোনো পর্বত গুহায় নির্জনবাসী মু'মিন উভয়ের উল্লেখ একই সাথে করেননি বরং প্রশ্নকারীর এ প্রশ্নের জবাব যে, 'সর্বোত্তম মানুষ কে ?' শুধু এতটুকু বলেই নিরব হয়েছেন যে, "যে মুসলমান নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" এবং যখন সে পুনর্বার জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর কে ?' তখন তার জবাবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাও আবার 'তারপর' শব্দ ব্যবহার করে। দুই, এ নির্জনবাসের একটি বিশেষ প্রয়োজন ও বিশেষ কারণ থাকতে হবে। তাহলো এই যে, মানুষ অন্যকে নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে অথবা নিজেকে অন্যের অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচাতে চায়।

দ্বিতীয় হাদীসটির ক্ষেত্রেও একই কথা। সেখানে নির্জনবাসের জন্য 'মানুষ শীঘ্রই এমন এক যুগে পদার্পণ করবে।' অন্য কথায় তখন একটি অস্বাভাবিক যুগ আসবে এবং মানুষ কিছু বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়ত যখন এমন যুগ আসবে তখন আল্লাহভীরু লোকেরা নিজেদের ছাগলের পাল নিয়ে পর্বত ও উপত্যকায় এজন্য চলে যাবে বা তাদের এজন্য চলে যাওয়া উচিত যে, তখন এভাবেই তাদের দীন ফিতনা থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

অনুরূপ আসহাবে কাহ্ফের যে ঘটনা থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, কুরআন মজীদ নির্জন জীবন যাপনকেও পসন্দীয় ইসলামী জীবন বলে

www.pathagar.com

গণ্য করে সেখানেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান। প্রথমতঃ তাঁরা মাত্র কয়েকজন ছিলেন। অন্যদিকে তাঁদের সমগ্র জাতি ছিল মুশরিক। দ্বিতীয়তঃ জাতির সামনে তাঁরা প্রকাশ্যে নিজেদের ঈমানের কথা প্রকাশ করেন। জাতিকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানান ঃ

اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ الكهف : ١٤

"যখন তারা উঠেছিল এবং তারা ঘোষণা করেছিল আমাদের রবতো শুধু তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের রব।"–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ১৪

তাঁরা কেবল জাতিকে আহ্বান জানাননি বরং চূড়ান্তভাবে আহ্বান জানান এবং বিতর্কে তাদেরকে লা-জবাব করে দেন ঃ

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ـ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ

"এই আমাদের জাতির লোকেরা তো বিশ্বের খোদাকে পরিত্যাগ করে অন্য খোদা বানিয়ে নিয়েছে। এ লোকেরা তাদের মাবুদ হওয়ার সমর্থনে কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে না কেন ?"

–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ১৫

তৃতীয়ত, পর্বত গুহাকে তাঁরা নিজেদের বাসস্থান নয় বরং আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁরা এমন অবস্থায় আশ্রয় নেন যখন তাদের জাতি তাঁদেরকে বরদাশত করতে অস্বীকার করে এবং লোকালয়ে বাস করার জন্য তাঁদেরকে নিজেদের প্রাণ ও ঈমান বিসর্জন দেবার প্রয়োজন দেখা দেয় ঃ

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ ـ

"তাদের কাছে আমাদের সংবাদ যদি একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা আমাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে। অথবা জোরপূর্বক নিজেদের মিল্লাত ফিরিয়ে নেবে।"–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ২০

কুরআন-হাদীসের বাণীর এ পর্যালোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তা থেকে নির্জনবাসের পদ্ধতি গ্রহণ করার যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা মোটেই সাধারণ ও শর্তহীন নয়। বরং তার সাথে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কতিপয় বিশেষ অবস্থায় এ পদ্ধতিকে কার্যকরী করা যায়। কোনো দীনী প্রয়োজন অথবা অন্যকথায় বলা যায়, দীনের ক্ষেত্রে কোনো বিরাট নিরুপায় অবস্থায় মুসলমানকে ওপথে পা বাড়াতে হয়।

www.pathagar.com

নির্জন জীবন কোন্ পথের ইসলামী জীবন ? এ প্রশ্নের জবাব জানার জন্য যেসব দিক দিয়ে চিন্তা ও পর্যালোচনা করা উচিত, প্রয়োজন মত ইতিপূর্বে করা হয়েছে। সে আলোচনার আলোকে এ ধারণার কোনো অবকাশই থাকে না যে, নির্জনবাসী জীবন ও জামায়াতী জীবন উভয়ই সকল দিক দিয়ে একই ধরনের ইসলামী জীবন। বরং জামায়াতী জীবনই আসল ইসলামী জীবন বলে গণ্য হয় এবং মূলত সেটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। আর নির্জনবাসী জীবন সম্পর্কে বলা যায় যে, তা কোনোক্রমেই আসল ইসলামী জীবন হতে পারে না এবং সাধারণ অবস্থায় তাকে কোনোক্রমেই গ্রহণ করা যেতে পারে না বরং তা কেবল সাময়িক ধরনের ইসলামী জীবন। কোনো বিশেষ অবস্থায় এবং নেহাত নিরুপায় হয়েই এ জীবন গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিশেষ অবস্থা হলো ফিত্না ও শিরকের অবস্থা আর এ চরম নিরুপায় অবস্থা হলো নিজের দীন ও ঈমানের নিরুপায় অবস্থা অর্থাৎ মুসলমানের দীনের দাবী পূর্ণ করার ও তার ঈমানের সমৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য আসলে যে সমাজ জীবনের প্রয়োজন, সে সমাজ জীবন যখন তার ঐ ক্ষমতা থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়, তার ঐ আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলী হারিয়ে ফেলে এবং দীন ও ঈমানের ব্যাপারে বিপরীত কাজ শুরু করে দেয়, তখন সে তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং অতীব দুঃখ ও আক্ষেপের সাথে নির্জনবাসী জীবনের পথ অবলম্বন করে—যে জীবনে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সুযোগ বহু ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত এবং যেখানে আল্লাহর বন্দেগী আংশিক সম্পাদন করা যেতে পারে।

সারকথা হলো এই যে, ঈমান ও ইসলামের আসল স্বদেশ হলো সমাজ জীবন। সমাজ জীবনেই তারা ইচ্ছামতো বিকাশ লাভ করতে পারে এবং নানান ফল-ফুলে সুশোভিত হতে পারে। কিন্তু যখন তাদের এ 'স্বদেশ' তাদেরকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেয় না, তখন বাধ্য হয়ে তারা 'অন্যের দেশে' আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নিভৃত কোণে গিয়ে মুসাফিরের ন্যায় সাদা-মাটা জীবন যাপন করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না।

শুধু এ নয় যে, নির্জন জীবন সাময়িক ধরনের ইসলামী জীবন বরং সমাজ জীবনের তুলনায় তার মর্যাদা দ্বিতীয় পর্যায়ে। একথা সত্য যে, অক্ষমতার কারণেই এবং দীন ও ঈমানের স্বার্থেই এ জীবন যাপন করা হয় এবং এ ব্যাপারে নিজের কোনো ত্রুটি কার্যকরী থাকে না, কিন্তু এ সত্ত্বেও এটিই বাস্তব সত্য এবং 'অক্ষমতা' ও 'ত্রুটিহীনতা'র কারণে এ ধরনের জীবন ইসলামী জীবনের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না এবং নির্জনে

www.pathagar.com

বসে আল্লাহর ইবাদাতকারী সমাজ জীবনে বাস করে কর্তব্য সম্পাদনকারীর সমান হতে পারবে না। এ মর্যাদার বিভিন্নতার কারণ সুস্পষ্ট। প্রথম ব্যক্তির ইবাদাত নামায, রোযা ইত্যাদি কতিপয় ব্যক্তিগত বন্দেগী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তির ইবাদাত ঐ ব্যক্তিগত বন্দেগী থেকে শুরু করে ধন ও প্রাণের সাহায্যে আল্লাহর পথে জিহাদের ন্যায় বন্দেগীর সর্বশেষ সীমা পর্যন্তও বিস্তৃত হয়। তাই প্রকৃতই প্রথম ব্যক্তির মর্যাদা দ্বিতীয় ব্যক্তির তুলনায় কম হওয়া উচিত। এটি কেবল বুদ্ধি ও বিবেকের সিদ্ধান্তই নয় বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বোল্লিখিত বাণীসমূহেও এর প্রমাণ রয়েছে। প্রশ্নকারী যখন প্রশ্ন করলো যে, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ?' তখন তার জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদকারী মু'মিন ও কোনো পর্বত গুহায় নির্জনে বসে ইবাদাতকারী মু'মিনের কথা এক সাথে বললেন না, বরং তিনি কেবল প্রথম পর্যায়ের মু'মিনের উল্লেখ করে নীরব হয়ে গেলেন। এর পরিষ্কার অর্থ হলো এই যে, আসলে 'সর্বোত্তম ব্যক্তি' কেবল এ ধরনের ঈমানদারগণ হতে পারেন, অন্য কোনো ধরনের মু'মিন তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। কাজেই যখন দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা হলো যে, 'তারপর কে ?' তখন বলা হলো যে, 'তারপর সেই মু'মিন যে কোনো পর্বত গুহায় নির্জনবাসী হয়ে সেখানে নিজের প্রতিপালকের ইবাদাত করে।' এখানে প্রশ্নকারীর 'তারপর' শব্দ ব্যবহার করা ও জবাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকেও ঐ একই শব্দ দিয়ে শুরু করা এ সত্যটিকেই আবরণমুক্ত করে যে, নির্জনবাসের স্থান সমাজ জীবনের তুলনায় নিম্নতম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের। শরীআতের ভাষায় একথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, নির্জনবাসের পথ অবলম্বন করা কোনো কর্তব্য নয়, বরং একটি সুবিধা। তাই ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর হাদীস গ্রন্থে নির্জনবাস সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করার জন্য যে শিরোনামা নির্ধারণ করেছেন তাহলো 'ফিত্‌নার সময় যে রুখসত বা সুবিধা দান করা হয়েছে।'

এ কারণেই এ ধরনের জীবন 'ইসলামী' হওয়া সত্ত্বেও আমরা এর স্বপক্ষে কোনো পয়গাম্বরের জীবন ও আদর্শের সন্ধান পাই না। হাজার হাজার পয়গম্বরের মধ্যে একজনও কখনো এ জীবন গ্রহণ করেননি। অথচ তাঁরা যেসব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন আমরা তার যথার্থ ধারণাও করতে পারি না। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন, তাই তাঁদের জন্য লোকালয় থেকে পৃথক থাকার ও কর্তব্যের পরিবর্তে সুবিধাজনক জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না। এর কারণ হলো এই যে,

www.pathagar.com

লোকালয় থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর তাঁরা পয়গম্বরীর দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারতেন না এবং সুবিধাজনক পথ অবলম্বন করার প্রয়োজন তাঁদের এজন্যই ছিল না যে, তাঁদের জন্য মানুষকে নিজেদের অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচাবার ও নিজেদের (দীন ও ঈমান)-কে অন্যের অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষণ করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। আর প্রাণভয় সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা নিজেদের প্রাণকে কখনো 'নিজেদের' মনে করতেন না। কাজেই প্রাণ বাঁচাবার জন্য সমকালীন যালেম শাসকদের থেকে দূরে পালিয়ে যাবার প্রয়োজনই তাঁদের ছিল না।

অবস্থা ও শর্তাবলী

এখন একথা জানতে হবে যে, শরীআত কোন্ বিশেষ অবস্থায় এ সুযোগ দান করেছে ? এর নীতিগত জবাব আগের আলোচনায় পরিষ্কারভাবে দেয়া হয়েছে। তার সারমর্ম হলো এই যে, যখন সমাজ অনিষ্টকারিতা ও ফিতনার কবলে পড়ে, তখন কেবল সেই ব্যক্তিকেই ইসলামের প্রত্যাশিত সমাজ জীবন ও তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিরত থাকার নির্দেশ বা সুবিধা দান করা হয়, যে ঐ ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে নিজের দীন ও ঈমানকে বাঁচার জন্য ঐ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি মনে করে। তাই দ্বিতীয় হাদীসটিতে 'নিজের দীনকে আঁকড়ে ধরে ফিতনা থেকে দূরে পলায়ন করতে থাকবে' বাক্যটি একথাটিকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। অনুরূপভাবে প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন যে, সেখানে 'কোনো পর্বত গুহায় গিয়ে নির্জনবাসী হওয়া' সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক কেবলমাত্র ফিতনার যুগের সাথে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ وهو مقيد بوقوع الفتن)এবং হাদীসের শেষ বাক্যাংশ 'মানবসমাজকে তার অনিষ্টকারিতাসহ দূরে রেখে আসে' থেকেও একথাই জানা যায়।

কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত ও নীতিগত জবাব থেকে বক্তব্য সম্ভবত পুরোপুরি সুস্পষ্ট হতে পারেনি, তাই হাদীসে উল্লেখিত এ ফিত্না ও অনিষ্টকারিতার ধরন নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এ ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা বলতে কি বুঝায় তা অবশ্যি জানা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য এর অর্থ সাধারণ ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা হতে পারে না। কেননা এ অর্থে তো পৃথিবী কোনো এক যুগেও ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত ছিল না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত ছিল না। কেননা সে সময় কমপক্ষে মুনাফেকীর ফিতনা তো ছিলই এবং এছাড়াও পারস্পরিক বিরোধের কারণে রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও

www.pathagar.com

দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ফিতনার কারণে মু'মিনকে সমাজ জীবন ও তার যাবতীয় দায়িত্ব থেকে পৃথক হয়ে কেবল আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হবার সুযোগ দেয়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ পর্যায়ের ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা নয়। বরং তা অস্বাভাবিক পর্যায়ের ফিতনা। তা কোন্ ধরনের ও কতটুকু অস্বাভাবিক ? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবার জন্য উল্লেখিত হাদীসগুলোর নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর ওপর পুনর্বার দৃষ্টিপাত করতে হবে ; 'নিজের দীনকে আঁকড়ে ধরে ফিতনা থেকে দূরে পলায়ন করতে থাকবে', মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে দূরে সরে আসে' ও 'মানব সমাজকে তার অনিষ্টকারিতাসহ দূরে রেখে আসে।' এ বাক্যগুলো থেকে জানা যায় যে, 'ফিতনা' ও 'অনিষ্টকারিতা' অর্থে সমাজের এমন মারাত্মক ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা বুঝায় যেখানে সবরকমের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও মুসলমান তার দীন ও ঈমানকে নিরাপদ রাখতে পারে না এবং অনিষ্টকারিতা ও বাতিলের অগ্রসরমান বিপুল প্রবাহ তার ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে ; এতদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন করে যে, অন্যের অসৎ প্রবণতা ও তার চিন্তা ও মানসে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং পরিবেশের আবর্জনা তার সারা শরীরে লেপটে যায় এবং ভবিষ্যতে সেও ফিতনা ও অনিষ্টকারিতার নিশানবরদার ও অনষ্টকারিতার প্রচারক হয়ে যেতে পারে।

এখান থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি অবস্থা এতটুকু খারাপ না হয়ে থাকে যে, দীন ও ঈমানের পক্ষে তাকে তেমন ভয়াবহ বলা যায় না, তাহলে এ 'সুযোগ ও সুবিধা' গ্রহণকারী ন্যায়সংগত বলে বিবেচিত হবে না। এ অবস্থায় মু'মিনকে সমাজ জীবন থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার, জাতীয় সমাজ সংগঠনের দাবী উপেক্ষা করার, কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার এবং জাতিকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। জাতি ইচ্ছামতো নিজের সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিতে থাকবে, তার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সৎ ও সততার যেসব শিখা মুখগুঁজে পড়ে আছে তাও দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হতে থাকবে এবং এভাবে সে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে কার্যত বহুদূরে চলে যাবে আর মু'মিন তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্জনবাসী হবে, এ অনুমতি তাকে দেয়া যেতে পারে না। তবে যখন জাতির মধ্যে প্রত্যাশিত সামষ্টিক সংগঠন কার্যত বিদ্যমান থাকে এবং সমাজে সৎ ও সততা প্রতিপত্তি লাভ করে, তখন অবশ্যি এ সুবিধা গ্রহণ করলে তা সহনীয় হতে পারে। তখন যদি কিছু লোক নিজেদের বিশেষ রুচি-প্রকৃতির কারণে বাইরের জগত থেকে সম্পর্ক

www.pathagar.com

ছিন্ন করে নির্জনবাসী হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, জাতি সামষ্টিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে এবং তার বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ তার সেবায় ও প্রহরায় নিযুক্ত আছে। তাই কিছু লোক যদি নির্জনবাসী হয়ে পড়ে এবং নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়েই শিক্ষা, সাধনা ও দীনী প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। যদিও এর পর এতটুকু অবশ্যি বলা যাবে যে, তারা একটি অধিকতর ভাল কাজ ত্যাগ করে একটি অপেক্ষাকৃত কম ভাল কাজের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু জাতি যদি উল্লেখিত অবস্থায় না থাকে, যদি সে নিজের সামাজিক সংগঠন বিসর্জন দিতে থাকে, যদি মু'মিন 'আল-জামাআত' থেকে বিশৃংখল জনতায় পরিণত হতে থাকে, যদি মুসলিম সমাজের সামগ্রিক গতি ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো দিকে মোড় নেয়, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে যথার্থ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা যদি কার্যকরী না থাকে, তাহলে দীনের ক্ষেত্রে যথার্থ কোনো বিপদ ছাড়াই নির্জনবাসী হয়ে যাওয়া এবং জাতির সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া কোনো ক্রমেই ইসলামী ধরনের ইবাদাত পদ্ধতি ও ইসলামী ধরনের জীবন পদ্ধতি হতে পারে না।

কাজের ধরন

পরিশেষে আর একটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ থেকে যায়। তা হলো এই যে, নির্জনবাসের বাস্তব রূপ কি হবে ? আর সমাজ জীবন থেকে পৃথক জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করার যে সুযোগ শরীআত দিয়েছে তার সীমানা কি হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে কোনো একটিমাত্র ধরনের নাম নেয়া যেতে পারে না। কেননা এটি সর্বতোভাবে অবস্থার ওপর নির্ভর করে। আর অবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক যুগের জন্য একরকম হতে পারে না। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কোনো ব্যক্তির দীন ও ঈমানের জন্য অবস্থা যে পরিমাণ প্রতিকূল ও ভয়াবহ হবে সেই অনুপাতেই তাকে নির্জনবাস ও সমাজ জীবন থেকে দূরের জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন ঃ

[১] এ অবস্থা যদি খোদানাখাস্তা এতদূর খারাপ হয়ে যায় যে, দীনের মূলনীতিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে এবং তার মৌলিক শিক্ষাসমূহের ঘোষণা ও প্রচারও বরদাশত করা হয় না, তাহলে তখন নির্জনবাসের চরম অর্থ ও তার সর্বশেষ ধরনটি গ্রহণ করা যাবে। আসহাবে কাহ্‌ফের জীবন ও আদর্শে এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তাঁরা পূর্ণাঙ্গ সমাজ ত্যাগ ও নির্জনবাসের জীবন কেবল তখনই গ্রহণ করেছিলেন যখন

www.pathagar.com

তাঁদের জন্য নিজেদের এলাকায় ও জনসমাজে সত্যের বাণী উচ্চারণ করার অনুমতি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, এবার মানুষের সামনে আমাদের মুখ থেকে সত্যের বাণী বের হলেই আমাদের ওপর পাথরী বৃষ্টি শুরু হবে।

[২] আর অবস্থা যদি এমন ভয়াবহ না হয়ে থাকে তাহলে তখন নির্জনবাসের ও সমাজ থেকে পৃথক জীবন যাপন করার যে পদ্ধতি গৃহীত হবে তা ঠিক এমনটি হবে না বরং তা এর থেকে অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের হবে। অর্থাৎ তা কিছুটা এ ধরনের হবে যে, মানুষ পুরোপুরি লোকালয় ত্যাগ করবে না কিন্তু সাধারণ সামাজিক ব্যাপারসমূহ থেকে পৃথক হয়ে যাবে, ফিতনার ঝাণ্ডাবাহীদেরকে তাদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে এবং তাদের প্রজ্জলিত অগ্নি নির্বাপনের জন্য হস্ত ও জিহ্বায় প্রচেষ্টাবলীর পরিবর্তে কেবল মনে মনে তাদেরকে ঘৃণা করবে। নিজের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করার জন্য কোনো বৈধ জীবিকা —মামুলি ধরনের জীবিকা অবলম্বন করবে, নিজের আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে এবং তার ওপর সাধারণ মুসলমানের যে অধিকার আছে তা আদায় করতে থাকবে।

সাধারণ ধারণা মতে নিকৃষ্টতম মুসলিম সমাজের খারাপ পরিস্থিতি সম্পর্কে এ ধরনের আশংকা করা যেতে পারে। তাই যে হাদীসমূহে এ সংসার ত্যাগ বা নির্জন জীবন-যাপনের সুযোগ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে নামাযের সাথে সাথে যাকাত আদায় করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ থেকে একথারই সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কেননা যাকাত একমাত্র তখনই আদায় করা যেতে পারে যখন অন্যান্য লোকদের সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকবে। গিরি গুহায় বা গভীর জংগলে একে কার্যকর করার কোনো পথই নেই।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা

পরিশেষে এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়াও প্রয়োজন যে, পরিস্থিতির নাজুকতা ও ভয়াবহতার পর্যায় নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ও চরম নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রয়োজন। কেননা মানব প্রকৃতির দুটি প্রবণতা এ ব্যাপারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং অতীতে দাঁড়িয়েছেও। তন্মধ্যে একটি হলো নির্জনবাস প্রবণতা এবং দ্বিতীয়টি হলো কৃচ্ছ্রসাধন প্রবণতা।

www.pathagar.com

তাই প্রবল আশংকা আছে যে, কোনো ব্যক্তি এ প্রবণতা দুটির যে কোনো একটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নির্জনবাসের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে এবং নিজের ঐ ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতা প্রভাবিত অবস্থার ভয়াবহতা আন্দাজ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে পারে। অতপর তাকে নিজের দীন ও ঈমানের জন্য এত বেশি ভয়াবহ মনে করতে পারে যতটা সে আসলে নয়। অতপর নির্জনবাস সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের ওপর নির্ভর করে জাতীয় সংগঠন ও সমাজ জীবন থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে অথবা এ সমাজ ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। বলাবাহুল্য, তার এ সিদ্ধান্ত হবে আসলে নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও খাহেশ পূরণ করার জন্য, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের অনুসৃতির জন্য নয়।

মু'মিনের সত্যিকার খাহেশ ও সর্বশেষ প্রচেষ্টা এ সম্পর্কে এ হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব সমাজ দেহের সাথে তাকে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং সমাজকে স্থায়িত্ব দান, তার উন্নতি ও পুনর্বহালের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না এবং সমাজ থেকে পৃথক হবার কথা একমাত্র তখনই চিন্তা করবে যখন সমাজ দেহ তার দীন ও ঈমানের জন্য প্রকাশ্য বিপদে পরিণত হবে। এ সময়ও নিজের পসন্দমত তার সমাজ থেকে পৃথক হওয়া উচিত হবে না, কেননা ইসলাম দীন ও দীনদারীর যে ধারণা দিয়েছে তার দৃষ্টিতে আসলে এটি কোনো পসন্দের কথা হতে পারে না। সমাজ জীবন ত্যাগ করা হাতের বড় বড় নখ কেটে ফেলার মত নয় যে, তার ফলে আনন্দ অনুভূত হবে। বরং তা যেন নখ থেকে গোশ্‌ত পৃথক হয়ে যাবার ন্যায়। এতে যে কষ্ট অনুভূত হয় কোনো বুদ্ধিমান ও সচেতন ব্যক্তি তা সানন্দে বরদাশত করতে চাইবে না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-৯ খণ্ড)
  - মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- মহিলা ফিকহ (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
- ফিকহী বিশ্বকোষ (১-৮ খণ্ড)
  - ড: মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
- বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)
  - তালিবুল হাশেমী
- মহানবীর সীরাত কোষ
  - খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com